শিক্ষণীয় মজার গল্পের অপূর্ব সমাহার

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়



মুনীরুল ইসলাম

শিক্ষণীয় মজার গল্পের অপূর্ব সমাহার

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়

সংকলন ও সম্পাদনা :
মাওলানা মুনীরুল ইসলাম
সহকারী সম্পাদক, মাসিক আদর্শ নারী

নাদিয়াতুল কুরআন কুতুবখানা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়

মুনীরুল ইসলাম

প্রকাশক : মাওলানা মাসউদুল হাসান
নাদিয়াতুল কুরআন কুতুবখানা
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭৫০৮২, ৭৩১০১৫৩

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০০৯

স্বত্ব : সংরক্ষিত

বর্ণবিন্যাস : ফোর আর এন্টারপ্রাইজ
৩৭, শহীদ পার্ক মসজিদ মার্কেট
মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ফোন : ০১৮১৮২৮৬০৪১

প্রচ্ছদ : আশরাফুল ইসলাম, সৃষ্টি গ্রাফিক্স

মুদ্রণ : নাদিয়াতুল কুরআন প্রিন্টার্স, লালবাগ, ঢাকা।

বিনিময় : ২০০ (দুইশত) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

স্নেহের ইয়াসমিন, রাশিদা, জামাল, সেলিনা, এমরান, সুমি
আল-আমিন, তানিয়া, সোনিয়া, মুন্নি
ফাতেমা, রাব্বি, আনিস
মনির, নার্গিস, ময়না
তোফায়েল, সুমাইয়া, ইসমত আরা ও সাবিকুন নাহার-কে
যারা আমার অতি কাছের চুম্বক পাঠক-শ্রোতা।

———————————— ***তোমাদের ভাইয়া***

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

১। ঘুমিয়ে কাজা করছি ফজর
২। পৃথিবীতে হলো হাশরের বিচার
৩। সেরা ঊনচল্লিশ এবং আমি
৪। বিজয় নামের পাখি (কবিতা)
৫। রক্তভেজা জায়নামায
৬। বেহেশতের সঠিক পথ (সম্পাদিত)
৭। গল্পে গল্পে তরুণ-তরুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ (সম্পাদিত)
৮। রোযা পালনের সঠিক নিয়ম (সম্পাদিত)
৯। আল-কুরআনের জ্ঞানসমুদ্র

সূচিপত্র

৭ ..... কাজ বদলের ঝামেলা
১০ ..... লোভের পরিণাম
১২ ..... গাধা পিটিয়ে মানুষ
১৪ ..... আপনাকে ওয়াক 'থু'
১৫ ..... পরাজিত হলো শয়তান
১৮ .... লাভের চেয়ে লোকসান বেশি
১৯ ..... উস্তাদজীর কান্না
২০ ..... র‍্যাট ফ্রাইয়ের মজা
২২ ..... দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা
২৩ ..... অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ
২৪ ..... সোজা শ্বশুর বাড়ি
২৭ ..... উল্টাটাই সোজা
২৯ ..... কুকুর নাকি বকরী
৩০ ..... যাকে বলে বোকা
৩২ ..... কানে কম শোনার কারণে
৩৩ ..... একশ' মোহরের লোভে
৩৪ ..... বাদশাহর পরীক্ষা
৩৭ ..... বুদ্ধির জোরে
৩৯ ..... ভণ্ডের পলায়ন
৪০ ..... স্বার্থ ফুরালে কেটে পড়ে
৪২ ..... অলসতার কারণে
৪৪ ..... নাতি ও জ্বীন
৪৫ ..... স্বার্থপরের পরিণাম
৪৬ ..... কলমের জোরই বেশি
৪৮ ..... দূর হলো কৃপণতা
৫০ ..... হায়রে বোকার দল
৫১ ..... কুমির ও শিয়াল
৫৩ ..... মূর্খ আবিদের কাণ্ড
৫৫ ..... জমে আমারে নিল না
৫৬ ..... শক্তির চেয়ে বুদ্ধিই বড়

❖ হাঁড় কিপ্‌টে ৫৮
❖ মিঠাইয়ের অভিযোগ ৬১
❖ এখন শুধু ইনশাআল্লাহ ৬২
❖ স্বয়ং বাদশাহর বাড়িতে চুরি!.... ৬৩
❖ কথা লাগানোর যম ৬৭
❖ হরিণের বুদ্ধি ৬৯
❖ একজোড়া পুরাতন জুতা ৭০
❖ বকের দুষ্ট বুদ্ধি ৭৩
❖ মতলববাজ শিয়াল ৭৪
❖ উল্টো বুঝল রে! ৭৬
❖ পাঞ্জাবী বনাম বাঙালী ৭৭
❖ সারাজীবন বসে খাবে ৭৯
❖ মিথ্যা ইনফরমেশন ৮০
❖ ছাগল-ভেড়ার বুদ্ধি ৮১
❖ শিয়ালের আঙ্গুর খাওয়া ৮৪
❖ বন্ধু দোষে ৮৬
❖ ছত্রভঙ্গ করে প্রতিশোধ ৮৭
❖ আজরাইলের আগমন! ৮৯
❖ চাকরি পরীক্ষায়ও নকল! ৯১
❖ ষাড়ের সাথে পাল্লা! ৯৩
❖ সুখে থাকলে ভূতে কিলায়..... ৯৪
❖ ঠকবাজের দল ৯৭
❖ পরের ধনে পোদ্দারী ৯৯
❖ ভণ্ডপীরের পরিণতি ১০০
❖ ভুল বুঝলো..... ১০১
❖ মুরগীর মাথা কোথায়..... ১০২
❖ মরেও জ্বালাচ্ছে..... ১০৪
❖ বুদ্ধির ঢেঁকি ১০৫
❖ মানুষের সন্ধানে..... ১০৬
❖ অন্যায়পুরের অন্যায় কাজ..... ১১০

কাজ বদলের ঝামেলা

চাষী আর চাষীর বৌয়ের মধ্যে প্রতিদিন ঝগড়া হয়। চাষী বলে, 'আমি একা খেটে মরি, রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি। আর তুমি ঘরে বসে বসে খাও, শুয়ে বসে দিন কাটাও।' চাষীর বৌ বলে, 'ঘরের কাজগুলো কে করে? কে রান্না করে? কে কাপড় ধোয়? কে ঘর-দুয়ার ঝাঁড়ু দেয়? কে নদী থেকে পানি আনে? কে গরু-ছাগল দেখে? কে বাচ্চার দেখাশোনা করে? কে ক্ষেতের ফল ঝাড়াই-মাড়াই করে ঘরে তোলে?' চাষী বলে–'ধুর ওসব আবার কাজ নাকি? ওতো আমি দশ মিনিটে করে ফেলতে পারি।'

চাষীর বৌ একদিন বলল, 'ঠিক আছে, এত কথার কাজ নেই। আসুন, আমরা দু'জনে কাজ বদল করি। আপনি করবেন ঘরের কাজ, আর আমি মাঠের কাজ।' চাষী বলল, 'বেশ, তা-ই হোক।'

পরদিন ভোর হতেই চাষীর বৌ ঘুম থেকে উঠল। ঝটপট তৈরি হয়ে এলো চাষীর কাছে। বলল, আমি মাঠে চললাম। আপনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।

বৌ চলে যাওয়ার পর চাষী মনে মনে বলল, যাক বাবা! এতদিনে একটু শান্তি পাওয়া গেল। আজ থেকে আর মাঠে যেতে হবে না। ভাবতে ভাবতে চাষীর চোখে আবার ঘুম নেমে এলো। সেই ঘুম ভাঙল বেশ বেলা করে।

চাষী বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে সে ভাবল–আগে নাস্তাটা সেরে নেওয়া যাক। হাঁড়ি-পাতিল খুঁজে চাষী পেল পানতা ভাত। তা-ই সে পেট পুরে খেয়ে নিল।

এবার কী করা যায়, ভাবতে লাগল চাষী। আগে ঘর-দুয়ার ঝাড়ু দিয়ে দিই। ঘর ঝাড়ু দিতে দিতে চাষীর কোমর ধরে এলো। নাহ্ থাক, বৌ তো রোজ ঝাড়ু দিচ্ছেই, একদিন না দিলে কিছু হবে না। তার চেয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।

পিঁড়িটা পেতে চাষী একটুখানি বসেছে, অমনি ঘর থেকে ভেসে এলো বাচ্চার কান্নার আওয়াজ। সে ছুটে গেল বাচ্চার কাছে। কাঁদছিস কেন? খিদে পেয়েছে বুঝি? একটু চুপ থাক বাবা। আমি গরুর দুধটা দুইয়ে আনছি। চাষী

এলো গোয়াল ঘরে, কিন্তু এর আগে কোনোদিন সে দুধ দোহন করেনি। তাই বালতিটা কেন জানি নড়ছে। নাহ, এ-ওতো কম ঝামেলা নয়।

ওদিকে বাচ্চাটা কেঁদেই চলেছে। বাচ্চার কান্নাকাটি শুনে পাশের বাড়ির বৌ দৌড়ে এলো। ও চাষী বৌ, চাষী বৌ! বাচ্চাটা কাঁদছে কেন? গোয়াল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাষী বলল, চাষী বৌ বাড়িতে নেই। একটু বাইরে গেছে। বৌটি বলল, বাচ্চার কান্না শুনে ছুটে এলাম। ভাবলাম–কী হল আবার? ঠিক আছে আমি বাচ্চাটা নিয়ে যাই। চাষী বৌ ফিরে এলে নিয়ে আসবেন। চাষী বলল, তাহলে তো ভালই হয়। পাশের বাড়ির বৌয়ের কোলে বাচ্চাকে তুলে দিয়ে চাষী আবার এলো গোয়াল ঘরে।

কিন্তু একি! দুধের বালতিটা কাত হয়ে পড়ে আছে! সব দুধ মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। সে বুঝতে পারল, গরুর পায়ের ধাক্কা লেগে বালতিটা পড়ে গেছে। ওটা এক পাশে সরিয়ে রাখা উচিত ছিল। যাক, যা হবার হয়েছে।

ততক্ষণে সূর্য মাথার উপর উঠে এসেছে। সারা উঠোনে রোদ। চাষীর মনে পড়ল–ধান শুকাতে হবে। ইস! আর একটু পরেই তো রোদ চলে যাবে উঠোন ছেড়ে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে ধান এনে উঠানে ছড়িয়ে দিল। সাথে সাথে উড়ে এল দু'টি কাক। এসেই ধান খেতে শুরু করল। চাষী ঢিল ছুড়ে কাক দু'টিকে তাড়াল। কিন্তু একটু পরেই ওরা আবার এসে হাজির হল। সাথে আবার এলো তিনটি চড়াই। চড়াইগুলো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ে আর ধান খায়। নাহ্, এদের সঙ্গে পারে সাধ্য কার? ঢিল ছুড়তে ছুড়তে চাষীর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

এদিকে রান্নার বেলাও বয়ে যাচ্ছে। সে রান্না ঘরে ঢুকে চুলায় চাল চড়িয়ে দিল। কিন্তু উঠানে কাক-চড়াইগুলো দলে দলে এসে হাজির হল কিনা কে জানে? বাইরে গিয়ে একটু দেখা দরকার।

বাইরে এসে তার চোখ তো ছানাবড়া। দড়ি ছেড়ে এক গরু এসে মনের আনন্দে ধান খাচ্ছে। চাষীর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ছোট একটা লাঠি নিয়ে গরুটাকে তাড়া করল। গরুটা দিল একটা লম্বা দৌড়। চাষী ছুটল তার পেছনে পেছনে। মাঠ-ঘাট জঙ্গল পেরিয়ে সেকি ছোটাছুটি! কিন্তু গরুর নাগাল সে পেল না। মন-মেজাজ খারাপ করে ফিরে এলো বাড়িতে।

উঠানে পা দিতেই চাষীর নাকে এলো পোড়া গন্ধ। সে তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে ঢুকল। যা ভেবেছে তা-ই। পোড়া ভাত থেকে ধোয়া উড়ছে। হাঁড়িতে একটুও পানি নেই। সে চুলা থেকে হাঁড়িটা নামিয়ে রাখল। চাষী ভাবল–আগে তরকারী রান্না করি, পরে আবার ভাত বসাব। তরকারী রাঁধতে গিয়ে বিপদ হল। সবজি কোটা, মাছ কাটা এর কোনোটাই তো সে জানে না। আর সবচেয়ে বিপদের কথা–লবণ কতটুকু দিতে হবে, তেল কতটুকু দিতে হবে, মরিচের গুড়া আর হলুদই বা দিতে হবে কতটুকু কিছুই জানে না। চাষী মনে মনে বলল, আরে বাবা, এতসব ভাবতে হবে না। একরকম হলেই চলবে–এই বলে সে তরকারী রাঁধার কাজ শুরু করে দিল।

রান্নার পর তরকারীর যা রং দাঁড়াল, তা দেখে চাষীর নিজেরই পছন্দ হলো না। ভয়ে একটুখানি তরকারী মুখে দিল। সর্বনাশ, এ যে একেবারে তিতা হয়েছে। এবার চাষীর মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল। লাথির পর লাথি মেরে সে সব হাঁড়িকুড়ি ভাঙতে লাগল। ঘরজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল পোড়া ভাত, তরকারী আর ভাঙা হাঁড়ির টুকরা।

এদিকে বিকাল হতে আর দেরি নেই। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সবকিছু ফেলে চাষী চলে এলো শোবার ঘরে। গায়ে কাঁথা জড়িয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল টানটান হয়ে।

বিকালে মাঠের কাজ সেরে চাষীর বৌ ফিরে এলো বাড়িতে। সারাদিন খাটুনির পর হয়রান হয়ে সে ফিরেছে। খুব খিদেও পেয়েছে তার। কিন্তু উঠানে পা দিতেই কেমন যেন লাগল তার। ব্যাপারখানা কী? কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই! বাচ্চাটা কোথায়? চাষীই বা গেল কোথায়? সারা উঠানে ধান ছড়িয়ে আছে। গরুটা কি বাঁধা আছে গোয়ালেই?

সে প্রথমে ঢুকল রান্না ঘরে। কী সর্বনাশ! রান্না ঘরের একি কাণ্ড! সব হাঁড়িকুড়ি ভাঙা। ভাত তরকারী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মনে হচ্ছে কোনো বুনো জানোয়ার এসে সব তছনছ করে রেখে গেছে। চাষীর বৌ বলল–তুমি কোথায় গো? চাষী বিছানা থেকে জবাব দিল–আমি এখানে।

বৌ তাড়াতাড়ি ঘরে এলো। বলল, কি ব্যাপার! এই শেষ বিকালে তুমি শুয়ে আছো। দুপুরে আমার খাবার নিয়ে মাঠে যাওয়ার কথা ছিল, তা-ও তো

গেলে না। চাষী বলল, আমি নিজেই খাইনি, তোমার খাবার নেব কোথা থেকে? বৌ বলল–তুমি কেন রান্না করোনি? চাষী বলল–খিদেয় আমার পেট জ্বলছে। আগে রান্না কর, পরে সব বলব। চাষীর বৌ তাড়াতাড়ি রান্না চড়াল। চাষীর বৌ বলল–মাঠে আমি যা করে এসেছি, তা দেখেও তোমার চোখ কপালে উঠবে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

শিক্ষা : *যার কাজ তারই সাজে*
অন্যে করলে লাঠি বাজে।

লোভের পরিনাম

এবার শুনাবো এক বুড়ো ও বুড়ির গল্প। নদীর পাড়ে বাস করতো এক বুড়ো আর এক বুড়ি। বুড়ো জাল দিয়ে নদীতে মাছ ধরতো, আর বুড়ি ঘরে বসে কাজ করতো। একদিন বুড়ো নদীতে মাছ ধরতে গেল। প্রথম জাল ফেললো, কোন মাছ উঠলো না। দ্বিতীয়বার জাল ফেললো, এবারো একই অবস্থা। এভাবে জাল ফেলতে ফেলতে বুড়ো হয়রান। কোন মাছের চিহ্নও নেই। চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বুড়ো শেষবারের মতো জাল ফেললো। এবার উঠলো অদ্ভুত এক সোনার মাছ। মাছটি অবিকল মানুষের গলায় বললো, আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি যা চাইবে, আমি তোমাকে তাই দেব।

সোনার মাছটির জন্য তার মায়া হলো। সে মাছটিকে নদীতে ছেড়ে দিল। সোনার মাছটি খুশি হয়ে বুড়োর মঙ্গল কামনা করে মিশে গেল অথৈ পানিতে।

বুড়ো ক্ষুন্ন মনে ফিরে গেল ঘরে। সব খুলে বললো বুড়িকে। কিভাবে জালে সোনার মাছ উঠলো, মাছ তাকে যা চাইবে তা দিবে বললো, বুড়ো কিছুই চাইলো না।

বুড়োর কথা শুনে বুড়িতো রেগেমেগে আগুন। বুড়ি বলল, তুমি কিছুই চাইলে না! অথচ আমাদের কোঠাবাড়ি কতই প্রয়োজন। যাও না! মাছকে কোঠাবাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে বল।

বুড়ো গেল নদীর ধারে, ডাকলো মাছকে। সাতরে এলো সোনার মাছ। বললো, কী চাই তোমার?

বুড়ো : বুড়ি চাইছে কোঠাবাড়ি। আমাকে থাকতে দিচ্ছে না ঘরে।

সোনার মাছ : ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর কুদরতে তোমার কুঁড়ে ঘরটি কোঠাবাড়ি হয়ে যাবে।

বুড়ো বাড়ি ফিরে এলো। কোথায় তাদের সে কুঁড়ে ঘর , এ যে একখানা কোঠাবাড়ি। বুড়োকে দেখেই অকৃতজ্ঞ বুড়ি গালাগাল শুরু করে দিল। ওরে বোকা বুড়ো! চাইলে মাত্র একখানা কোঠাবাড়ি? খেটে আর খেতে চাইনে। মাছকে গিয়ে বলো–হতে চাই জমিদারণী।

বুড়ো আবার ছুটে গেল নদীর পাড়ে। ডাকলো মাছকে। মাছ এলো তার কাছে। বললো আবার–কী চাই তোমার?

বুড়ো : বুড়ি আমার হতে চায় জমিদারণী।

সোনার মাছ : যাও, আল্লাহর কুদরতে তাই হবে। বুড়ো বাড়ি ফিরে দেখলো মস্ত এক জমিদার বাড়ি। দামী পোশাক পরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বুড়ি। চারিদিকে বেশুমার দাস-দাসী। কাউকে পেটাচ্ছে, কাউকে গালমন্দ করছে, কাউকে খাটিয়ে মারছে।

বুড়োকে দেখে বুড়ি আরো রেগে গিয়ে বললো, আর জমিদারণী থাকতে চাইনে, এবার হতে চাই রাণী।

বুড়ো অনেক বুঝালো বুড়িকে। রাণী হওয়া তার মানায় না। রাণীর মতো ভাষা জানে না সে। বুড়ি তেড়ে এলো। বুড়ো মনে খুব ব্যথা পেল বুড়ির আচরণে।

বুড়ো চলে গেল আবার সেই নদীর পাড়ে। ডাকলো সোনার মাছকে। মাছ এলো তার কাছে। বুড়ো দুঃখভরা মনে বললো–বুড়ি আমার থাকতে চায় না জমিদারণী, হতে চায় রাণী।

মাছ সান্ত্বনার সুরে বললো-তাই হবে, ফিরে যাও বাড়ি।

বুড়ো বাড়ি এসে দেখলো–এ যে রাজবাড়ি। রাণী হয়ে বসে আছে বুড়ি। দরবারে সব আমীর-উমারা। চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে লোক-লস্কর, কোমরে ঝুলছে অস্ত্র। অবস্থা দেখে বুড়ো থর থর করে কাঁপতে লাগলো। সাহস সঞ্চয় করে বুড়ো রাজদরবারে ঢুকলো।

জীর্ণ বুড়োকে দেখে ভারি অপমান বোধ করলো বুড়ি। তার ইশারায় কোটালরা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল বুড়োকে। বুড়ো মনের দুঃখে চলে গেল বাইরে। বাইরে লুকিয়ে লুকিয়ে কাটালো বেশ কিছুদিন।

বুড়ির আদেশে খুঁজে আনা হল বুড়োকে। বুড়ি বললো–যা, আবার গিয়ে মাছকে বলবি, থাকতে চাই না স্থলের রাণী। হতে চাই পানির রাণী। সোনার মাছ হবে আমার বাঁদী। খাটবে আমার ফরমাশ নিরবধি।

কিছুই বললো না বুড়ো। চলে গেল নদীর পাড়ে। ডাকলো সোনার মাছকে। কাছে এলো মাছ। বললো, আবার কী চাই তোমার?

বুড়ো : দুঃখের কথা কী আর বলবো ভাই। স্থলের রাণী হয়েও বুড়িটার স্বাদ মিটলো না। হতে চায় সে পানির রাণী। তোমাকে রাখতে চায় বাঁদী করে। খাটবে তুমি নিরবধি। সে হতে চায় মহাসুখী।

সোনার মাছ : যাও, অকৃতজ্ঞতার পরিণাম দেখ। এই বলে সে চলে গেল অতল গভীরে। আর ফিরে এলো না। বাড়ি ফিরে এলো বুড়ো। কোথায় রাজপ্রাসাদ, কোথায় রাজবাড়ি। এ যে সেই জরাজীর্ণ কুঁড়ে ঘর। বুড়ি দরজায় বসে আছে মুখ ভার করে।

শিক্ষা : *লোভের পরিণতি এমনই হয়। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।*

গাধা পিটিয়ে মানুষ

এক গ্রামে বাস করতো এক কৃষক। কৃষক মানুষের জমিতে চাষাবাদ করে সংসার চালাতো। সে ছিল ভীষণ বোকা। সবাই তাকে বোকা চাষী বলে ডাকতো। চাষীর সংসারে ছিল চাষীর বউ আর পুত্রের মত পালিত একটা গাধা। চাষী যেখানেই যেত, গাধাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত।

একদিন চাষী আর গাধা কাজে যাচ্ছিলো। যেতে যেতে এক স্কুলের পাশে এসে থামলো। স্কুলে তখন ক্লাস চলছিল। মাস্টার এক ছাত্রকে পড়া না পারায় মারছিলেন। আর বলছিলেন, 'এই গাধা! তুই আর কী গাধা,

তোর চেয়ে বড় গাধাকেও আমি শিক্ষক-উকিল বানিয়েছি, আর তুই...।' বোকা চাষী স্কুলের পাশেই ছিল। সে শুনে মনে মনে গাধাকে স্কুলে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিল।

পরদিন চাষী গাধাকে সঙ্গে নিয়ে সেই শিক্ষকের কাছে গেল এবং শিক্ষককে বললো, স্যার! আপনি কত গাধাকে কত কি বানিয়েছেন–ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, এমনকি ভাল মানুষও বানিয়েছেন। আমার গাধাটা আপনার কাছে দিয়ে যাচ্ছি, ওকে ভাল মানুষ বানাবেন।

শিক্ষক বোকা চাষীকে অনেক করে বোঝালেন। কিন্তু চাষী ছিল বোকা, তাই সে কিছুই বুঝলো না। অবশেষে শিক্ষক বাধ্য হয়ে গাধাকে নিয়ে নিলেন এবং বেশ কয়েক বছর পরে চাষীকে দেখা করতে বললেন। বোকা চাষী আনন্দে চলে গেল।

চাষী প্রতিদিনই ভাবে–গাধা বড় হচ্ছে এবং মানুষ হচ্ছে। এটা ভাবতে ভাবতে অনেক বছর কেটে গেল। মনে মনে ভাবল–গাধাকে নিয়ে আসার সময় হয়ে গেছে।

বোকা চাষী তার বৌকে সঙ্গে নিয়ে এবং গাধার প্রিয় খাবার ঘাস নিয়ে শিক্ষকের কাছে হাজির হল। শিক্ষক তো কিছুই মনে করতে পারলেন না। বোকা চাষী সব বলে অবশেষে মনে করিয়ে দিল। শিক্ষক ভাবতে লাগলেন–হায়, আমি তো গাধাটাকে অনেক দিন আগেই একজনকে দিয়ে দিয়েছি। খোঁজ নিয়ে জানলেন–গাধাটা বেশ বড় ও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। শিক্ষক বোকা চাষীকে বললেন–তোমার গাধা তো আর গাধা নেই। সে এখন মস্ত বড় হয়ে গেছে। শিক্ষক বোকা চাষীর হাতে সেই লোকের ঠিকানা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি ওখানে যাও।

বোকা চাষী বৌকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলো গাধার গন্তব্যে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল, বিরাট একটা পাকা বাড়ি, অনেক মানুষ সেখানে কী যেন খাচ্ছে। বোকা চাষী সেখানকার একজন মানুষকে তার গাধা বলে ভাবল। গাধার লোম ছিল ধূসর বর্ণের। এই মানুষটির রঙও তেমনি। সেই মানুষের সামনে গিয়ে চাষী বলল–'গাধা! তুই কেমন আছিস? আগে তুই গাধা ছিলি, এখন মস্ত বড় মানুষ হয়েছিস। এই দেখ, আমি তোর প্রিয় ঘাস নিয়ে

এসেছি। নে নে খা, আগে কত মজা করে খেয়েছিস।'

ভদ্রলোক কিছুই বুঝলেন না। তিনি ভাবলেন–হয়তো পাগল হবে। পিয়নকে ডেকে বললেন, 'এদের দু'জনকে পেট পুরে খাওয়ানোর পর বের করে দিবে।' একথা বলে তিনি চলে গেলেন। বোকা চাষী চিৎকার করে বলল, গাধা! এই জন্য কি আমি তোকে মানুষ বানিয়েছি, শুধু খাওয়ায়ে বের করে দেওয়ার জন্য?

শিক্ষা : *কেজি কেজি ঘি মেখে যুগ যুগ ধরে চুঙার ভেতর ভরে রাখলেও কুকুরের লেজ কখনো সোজা হয় না।*

আপনাকে ওয়াক 'থু'

জনৈক বাদশাহর একজন বুদ্ধিমান সভাসদ ছিল। বাদশাহ তাকে খুব ভালবাসতেন। এই ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ বাদশাহ তাকে এক শাহী ক্ষমতা প্রদান করলেন–'তুমি যদি কোথাও কোনো বোকার সন্ধান পাও, তবে তার মুখে থুথু মারবে।'

এই ক্ষমতা পেয়ে সে বোকা লোকের সন্ধান করতে লাগলো। বড় বড় বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তিও তার সাথে কথা বলতে ভয় করত, না জানি আবার বোকামীতে ধরা পড়ে যায়।

এভাবে দীর্ঘ বারটি বছর চলে গেল, কিন্তু কোথাও কোনো বোকার সন্ধান পেল না। আর তার বাদশাহী ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারল না। এ জন্য তার মনে খুব দুঃখ ছিল।

একবার বাদশাহ অসুখের কারণে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বাদশাহ তার প্রিয় সভাসদকে কাছে ডেকে বললেন, শোন! আমি চললাম। সভাসদ জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! কোথায় চললেন?

বাদশাহ : এমন এক স্থানে, যেখানে গেলে কেউ আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারে না।

সভাসদ : সেখানে আরাম-আয়েশে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তো?

বাদশাহ : না, তা তোমরা পারবে না। এমন সরঞ্জামও আমার নেই, যা সেখানে প্রয়োজন হবে।

সভাসদ : তাহলে শুনুন হুজুর! দীর্ঘ বার বছর পূর্বে আপনি আমাকে একটা শাহী ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন যে, কোনো বোকা লোক পেলে তার মুখে থুথু দেওয়ার জন্য, তা আপনার স্মরণ আছে কি?

বাদশাহ : হ্যাঁ, অবশ্যই স্মরণ আছে।

সভাসদ : এই দীর্ঘ বার বছর পর্যন্ত আমি কোথাও কোনো বোকা পাইনি। তবে এইমাত্র একজন বোকার সন্ধান পেলাম, আর তা হলেন আপনি। কারণ, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরাম-আয়েশের জন্য আপনি প্রয়োজনের চেয়ে বহুগুণ সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছেন, অথচ যেখানে আপনাকে চিরকাল থাকতে হবে, সেখানকার জন্য আপনি কিছুই সংগ্রহ করেননি। আপনিই হলেন প্রকৃত বোকা। সুতরাং আপনাকে ওয়াক 'থু'।

শিক্ষা : *অন্যের দোষত্রুটি খোঁজার আগে নিজের দোষত্রুটি খোঁজা উচিত।*

পরাজিত হলো শয়তান

এক জমিদারের প্রচুর ধন-দৌলত ছিল। তার সম্পত্তি আর ভেড়ার পাল দেখাশোনার জন্য ছিল অনেক চাকর। জমিদার চাকরদের সাথে খুব মধুর ব্যবহার করতেন। চাকররাও তাকে খুব মান্য করতো আর ভালবাসতো। এই মনিবের মতো এতো ভাল মনিব পৃথিবীতে নেই। সত্যি সত্যি তার মতো ভাল মনিব হয় না। তিনি যার যতটুকু সাধ্য, তাকে ততটুকু কাজই দিতেন। সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ কারো উপর পড়ল কিনা তিনি তা লক্ষ্য রাখতেন। ভৃত্য বলে তিনি পশুর মতো খাটাতেন না। মানুষের মর্যাদা দিতেন। তাদের খোঁজখবর নিতেন। এমন মনিবকে পেয়ে ভৃত্যরা সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলো।

সে এলাকায় ঘোরাফেরা করতো এক দুষ্ট শয়তান। মনিবের সাথে ভৃত্যদের মধুর সম্পর্ক দেখে হিংসায় তার গা জ্বলে উঠল। সে চাইতো মনিব আর চাকরদের সাথে মধুর সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যাক। তাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধুক। তবেই তার শান্তি।

একদিন এক কর্মচারীকে আদর করে কাছে ডাকলো শয়তান। এ কর্মচারীটির নাম ফরিদ। শয়তান একজন ভাল মানুষ সেজে ফরিদের সঙ্গে বিভিন্ন আলাপ শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে বললো–আহা ভাই! তোমাদের মনিব নাকি খুব ভাল মানুষ? ফরিদ সরল মনে বললো–জ্বী, আমাদের মনিবের মতো ভাল মনিবই হয় না। শয়তান বিনীত সুরে বললো–কিন্তু একটা কথা কি জানো! মনিবরা কাজ আদায়ের জন্য কর্মচারীদের সাথে এমন ভাল ব্যবহার করে থাকে। একটু তার ক্ষতি করো, দেখবে কি নির্দয় ব্যবহার করেন তিনি।

শয়তানের কথাটি ফরিদের মনে ধরলো। সে ভাবলো–মনিবরা ভাল ব্যবহার করে কাজ আদায়ের জন্য, লোকটি ঠিকই বলেছে। ফরিদ অন্যান্য ভৃত্যদের মাঝে বলে বেড়াতে লাগলো–মনিবের গুণকীর্তন করা নেহায়েত বোকামী। আমরা ভালভাবে কাজ করি বলেই তিনি আমাদের সাথে এরকম ভাল ব্যবহার করেন। কাজে একটু ফাঁকি দিই, তার একটু ক্ষতি করি, তবেই দেখবে তিনি আমাদের উপর কেমন চটে যান।

ফরিদের কথায় অন্য ভৃত্যরা মনে খুব ব্যথা পেল। একজন বললো–আমাদের মনিব সম্পর্কে এমন খারাপ কথা বলতে পারলি? জানিস, তিনি এমন কথা শুনলে কতটা দুঃখ পাবেন?

দুঃখতো পাবেনই, কারণ আমিতো উচিত কথা বলেছি। মনিবের বাহ্যিক ভাল ব্যবহারে তোমরা মত্ত হয়ো না। আসলে ওটা তার দয়া নয়, ছাই।

এ নিয়ে ফরিদের সাথে ভৃত্যদের প্রচণ্ড তর্ক বেঁধে গেল। শেষে ফরিদ বললো–দেখবি, আমি মনিবকে ক্ষেপিয়ে তুলবো। তখন তিনি নিশ্চয়ই খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করবেন। ভৃত্যরা ফরিদের সাথে অযথা তর্ক না বাড়িয়ে এবার

বাজি ধরলো। যদি ফরিদ মনিবকে ক্ষেপাতে পারে, তবে সবাই চাকরি ছেড়ে চলে যাবে। আর যদি সে ক্ষেপাতে না পারে, তবে তাকে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হবে। সবাই এক বাক্যে উক্ত বাজিতে রাজি হয়ে গেল।

ফরিদ ছিল ভেড়ার রাখাল। সে মনিবের কিছুসংখ্যক প্রিয় ও দামী ভেড়া দেখাশোনা করতো। পরদিন জমিদার সাহেব এলেন কয়েকজন অতিথি নিয়ে। অতিথিরা ভেড়া দেখবেন। জমিদার সাহেব ঘুরে ঘুরে অতিথিদের তার প্রিয় ভেড়াগুলো দেখাতে লাগলেন। তখনো একটি মূল্যবান ভেড়া দেখানো হয়নি। ফরিদ কাছেই ছিল। অন্য ভৃত্যরা তার কাণ্ড লক্ষ্য করছিল। জমিদার সাহেব যখনই মূল্যবান ভেড়াটি দেখানোর জন্য দাঁড়ালেন, তখনই ফরিদ কি একটা অজুহাতে হাত নাড়া দিল, আর অমনি ভেড়াগুলো ভয়ে পালিয়ে গেল। সেই মূল্যবান ভেড়াটিও আর দেখা গেল না। জমিদার সাহেব বারবার চেষ্টা করলেন মূল্যবান ভেড়াটি অতিথিদের দেখাতে।

এবার জমিদার সাহেব ফরিদকে স্নেহের সুরে বললেন–বন্ধু আমার! বাঁকা শিংওয়ালা ভেড়াটাকে ধরো। কিছুক্ষণ ধরে রাখো আমাদের সামনে। ফরিদ সিংহের মতো লাফ দিয়ে ধরলো দামী ভেড়াটাকে। ভেড়ার পেছনের পা ধরে এমন জোরে টান দিল যে, বেচারা ভেড়াটার পা-ই ভেঙে গেল। সে এবার ধরলো বাম পা, তাও ভেঙে গেল। অতিথিরা চিৎকার দিয়ে উঠলো। কেউবা বললো–আহা, বেচারা ভেড়াটা মরে যাবে যে! অন্য ভৃত্যরা ফরিদের কাণ্ড দেখে তারাও দুঃখ পেল। জমিদার তো ব্যথা পেলেনই, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করলেন না।

এদিকে শয়তান কিন্তু কাছেই ছিল। সে একটি বড় গাছে বসে সবকিছু দেখছিল। ফরিদের কাণ্ড দেখে সে ভারি মজা পেল। মনে মনে কামনা করলো, এবার বড় ধরনের সর্বনাশ ঘটুক। মনিব রেগে গিয়ে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসুক। তবেই তার শান্তি।

কিন্তু না! ঘটলো তার বিপরীত। জমিদার ফরিদকে কাছে ডেকে বললেন–বন্ধু! আমার উপর রাগ করেছ? এই নাও কিছু অর্থ, আর এ

ভেড়াটা তোমাকে দিয়ে দিলাম। রাগ ঠাণ্ডা করে এসো।

ফরিদ জমিদারের মহত্ব দেখে ভৃত্য বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চাইল। তারা তাকে ক্ষমা করে দিল। আর ঐদিকে শয়তান জমিদারের মহত্বতায় হেরে গিয়ে পরাজয় বরণ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল গাছ থেকে।

শিক্ষা : *সত্য ও ন্যায়ের পথের লোকদেরকে ষড়যন্ত্র করে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে না।*

লাভের চেয়ে লোকসান বেশি

এক মুসাফির পথে বিশ্রাম করার জন্য একটি গাছের নিচে বসল এবং কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল। তার হাতে ছিল একটি সুন্দর ঘড়ি। দু'জন পথিক তখন গাছের নিচ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দৃষ্টি পড়ল ঘড়িটির দিকে। ঘড়িটি দেখে তাদের মনে লোভ বাসা বাঁধল। একে অপরকে বলল, কিভাবে ঘড়িটিকে আয়ত্ব করা যায়?

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে একজন অন্যজনকে কানে কানে বলল, আমি তোকে বলব–গাছতলায় গর্ত করে স্বর্ণের থলেটা রেখে দাও। তারপর আমরা ঘড়িটিকে তার হাত থেকে খুলে নিয়ে আসব। তখন যদি লোকটি জাগ্রত থাকে, তাহলে আমার কথা শুনে স্বর্ণের লোভে না ঘুমিয়েও ঘুমের ভঙ্গিতে শুয়ে থাকবে। এ সুযোগে আমরা ঘড়িটা খুলে নিয়ে আসতে পারবো। স্বর্ণের লোভে সে নড়াচড়া করবে না। কারণ সে তো ভাববে–আমরা চলে গেলে স্বর্ণের থলেটি গর্ত থেকে তুলে নিতে পারবে। যেহেতু স্বর্ণগুলো ঘড়িটি থেকে খুবই মূল্যবান। আর যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তো অনায়াসে ঘড়িটি খুলে নিয়ে আসব।

তারা গোপনে এই ফন্দি করার পর একে অপরকে উচ্চ আওয়াজে বলতে লাগল–স্বর্ণের থলেটি গাছের নিচে গুঁজে রাখো। আমরা এখন ঘড়িটি চুরি করব। শায়িত ব্যক্তিটি লোক দুটোর পায়ের আওয়াজ পেয়ে সজাগ হয়ে গিয়েছিল। তবু চোখ বন্ধ রেখেছিল। যখন একথা শুনল, তখন পড়ে গেল লোভে। মনে মনে

ভাবতে লাগল–ওরা আমার ঘড়িটি চুরি করতে আসলে আমি একটুও নড়াচড়া করব না। ওরা চলে গেলে স্বর্ণগুলো গর্ত থেকে উঠিয়ে নেব। একথা ভাবতে ভাবতে তারা ঘড়িটি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল।

এরপর লোকটি কৃত্রিম ঘুম থেকে উঠে অনেক্ষণ যাবত থলেটি খুঁজলো। কিন্তু কোনো গর্তের চিহ্ন খুঁজে পেল না। মাঝখানে সে ঘড়িটি হারাল।

শিক্ষা : *লোভের পরিণতি এমনই। কোনো কোনো সময় পুঁজিসুদ্ধ হারাতে হয়।*

উস্তাদজীর কান্না

এক মোল্লাজী এক ব্যক্তির বাড়িতে ছেলে-মেয়ে পড়াতেন। বাড়িওয়ালা বিদেশে গিয়ে একটি বড় চাকরি পেয়ে বসলো। অনেক টাকা বেতন। এ সুসংবাদ জানিয়ে সে বাড়িতে চিঠি লিখলো। চিঠি বাড়ির কেউ পড়তে পারতো না। তাই চিঠি পড়ে শোনাবার জন্য অবশেষে তারা চিঠিটি উস্তাদজীর কাছে নিয়ে গেল।

উস্তাদজী চিঠি পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বাড়ির সবাই উস্তাদজীকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, 'তোমাদেরও কাঁদা উচিত, তাই তোমরাও কাঁদো। কারণ পরে বলবো।'

তখন বাড়ির সবাই কাঁদতে লাগলো। তাদের কান্নার আওয়াজ শুনে পাড়ার সবাই ছুটে এলো। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। মোল্লাজী বললেন, 'তোমাদেরও কাঁদা প্রয়োজন, তাই তোমরাও কাঁদো। কারণ পরে বলবো, তখন পাড়ার লোকেরাও কাঁদতে লাগলো। হাউ মাউ রবে সারা গ্রাম ভারি হয়ে উঠলো।

যখন সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়ল, কান্নার রোল স্তিমিত হল, তখন সবাই মোল্লাজীকে জিজ্ঞাসা করলো, 'হুজুর! এ কান্নার কারণ কী?' উস্তাদজী বললেন, 'বাড়িওয়ালার চিঠি এসেছে। তিনি বড় ধরনের একটা চাকরি পেয়েছেন এবং অনেক টাকা বেতন।' লোকেরা বললো, 'এটাতো আনন্দের কথা। কান্নার তো কোন কারণ দেখি না।'

উস্তাদজী বললেন, 'তোমরা বুঝতেই পারছো না। যখন এত টাকা বেতন হয়েছে, তখন তিনি ছেলে-মেয়েদেরকে আর আরবী পড়াবেন না। বাড়িতে মাস্টার রাখবেন। আমার চাকরি যাবে। তাই আমার কান্না।'

তখন বাড়ির লোকেরা বলল–'তাহলে আমাদেরকে কাঁদতে বললেন কেন?' মোল্লাজী বললেন–'এমতাবস্থায় বেশি টাকার কারণে বাড়িওয়ালীর বদলে নতুন যুবতী বউ ঘরে আসবে। সংসার ভাঙবে। তাই বাড়ির সকলকে কাঁদতে বলেছি।'

তখন পাড়ার লোকেরা বলল–'তাতে আমাদের কী? আমাদেরকে কেন কাঁদতে বলেছেন?' মোল্লাজী উত্তর দিলেন–'বাড়িওয়ালা মহল্লায় এসে যখন বসবাস শুরু করবেন, তখন তার গাড়ি রাখার জন্য পাড়ার লোকদেরকে উচ্ছেদ করা হবে। আর তার বাড়িটি বড় করা হবে। সেজন্য পাড়ার লোকদেরকে করা হবে ভিটাছাড়া, বাস্তুহারা। সুতরাং পাড়ার সবাই না কেঁদে কি পারে?'

শিক্ষা : *বাস্তবে তাই হচ্ছে। কুরআন-হাদীসের শিক্ষা যেন আজ গরীবদের জন্য। ধনীদের জন্য নয়। হায়রে মুসলমান!*

র‍্যাট ফ্রাইয়ের মজা

এক ছিল ভীতু ইঁদুর আর চালাক বিড়াল। দু'জনের মধ্যে ছিল খুব বন্ধুত্ব। তবে চালাক বিড়াল ভীতু ইঁদুরকে ফ্রাই করে খাওয়ার লোভে তার সাথে বন্ধুত্ব করেছিল, আর সেজন্য বিড়াল সুযোগ খুঁজছিল।

একদিন বিড়াল শহরে গেল। শহরে গিয়ে সে বড় এক দোকান থেকে 'চাইনিজ স্যুপের' প্যাকেট চুরি করে নিয়ে এলো। তারপর সে ভীতু ইঁদুরকে একটু 'চাইনিজ স্যুপ' খেতে দিল। স্যুপ খেয়ে ইঁদুর তো মহাখুশি। সে পেট ফুলিয়ে বিড়ালকে বলল–বন্ধু, তুমি কী করে 'চাইনিজ স্যুপ' বানাও। আমাকে দয়া করে শিখিয়ে দেবে? সে জানতো না যে, বিড়াল শহর থেকে

চাইনিজ স্যুপের প্যাকেট চুরি করে নিয়ে এসেছে। তখন চালাক বিড়ালের মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এলো। সে ভাবল–এই তো সুযোগ। ইঁদুরকে ফ্রাই করে খাওয়া যাবে। সে বলল, বন্ধু! তুমি এই সহজ রান্না-ই পারো না? তাহলে তুমি কী পারো? যা হোক আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। বিড়ালের কথায় ইঁদুর লজ্জা পেল।

বিড়াল তখন ইঁদুরকে 'চাইনিজ স্যুপ' বানানো শেখাতে লাগল। সে বলল, প্রথমে আমি কড়াইতে তেল গরম করি, তারপর নিজের গায়ে বাটা হলুদ, লবণ আর বাটা মরিচ মাখি। তারপর গরম তেলে কিছু সময় শুয়ে থাকি। তা থেকে যা তৈরি হয়, তা হচ্ছে চাইনিজ স্যুপ। তারপর গরম গরম পরিবেশন করি।

বিড়ালের কথা শুনে ইঁদুর বাড়ি গেল আর বিড়াল তার পিছু পিছু গেল। সে কড়াইতে তেল গরম করে নিজের গায়ে বাটা হলুদ, লবণ আর যেই না মরিচ বাটা মাখল, অমনি গা জ্বলে উঠল। তবু সে চাইনিজ স্যুপ বানাবেই। যেই না সে গরম তেলে নামল, অমনি সে ভাজা হয়ে গেল। তখন বিড়াল এসে বলল–আমার মনের সাধ পূর্ণ হল। আমি এখন 'র‍্যাট ফ্রাই' খাব। কী মজা কী মজা। বিড়াল কড়াই থেকে ইঁদুর তুলে মজা করে খেল।

ওদিকে হয়েছে কি, ইঁদুর যেখানে বাটা হলুদ ইত্যাদি গায়ে মেখেছে, সেখানে বাড়ির মালিক ইঁদুর মারার জন্য 'র‍্যাট কিলার' ছিটিয়ে রেখেছিল। সেগুলোও ইঁদুরের গায়ে জড়িয়ে গিয়েছিল। তাই বিড়াল যখন সেই ইঁদুরের ফ্রাই খেল, অমনি সেই বিষে আক্রান্ত হল এবং ধাপরাতে ধাপরাতে বিড়ালটিও মারা গেল।

শিক্ষা : *অন্যের ক্ষতি করে নিজেও সুখে থাকা যায় না।*

দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা

নদীর ধারে ছিল একটা বটগাছ। সেই গাছে ছিল একটা বানর। বানরটি ছিল খুব চতুর। আর নদীতে থাকতো একটা কুমির। কুমিরটি প্রতিদিন বানরের কাছে আসতো। বানরের সঙ্গে ভাব জমাতো। রসালো আলাপ করতো। আর মনে মনে ভাবতো–বানরের কলিজাটা খেতে পারলে খুব মজা হত। বহুদিনের হৃদয়ে লালিত স্বপ্ন পূরণ হত।

প্রতিদিন আসা-যাওয়ায় তাদের উভয়ের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাই এক পর্যায়ে কুমির বানরকে বলল–বন্ধু! আমি প্রতিদিন তোমার বাড়িতে আসি। কই, তুমি তো একদিনও আমার বাড়িতে গেল না?

বানর বলল–বন্ধু! কোথায় তোমার বাড়ি? আমি তো চিনি না।

কুমির বলল–ঐ যে মাঝনদীতে একটি চর দেখা যায়। ওখানেই আমার বাড়ি। ওখানেই আমি থাকি।

বানর বলল–সেখানে আমি যাব কিভাবে? আমি তো সাঁতার জানি না।

কুমির বলল–তুমি আমার পিঠে চড়ে বস। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।

বানর কুমিরের কথামত তার পিঠে চড়ে বসলো। যেতে যেতে তারা যখন মাঝনদীতে এসে পৌঁছল, তখন কুমির তার গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে দিল। বলল–আরে বোকা বানর! কুমিরের কি কোন বাড়ি-ঘর আছে? সেতো পানিতেই থাকে। পানিতেই তার বাস। আমিতো তোমাকে এনেছি তোমার কলিজাটা খাওয়ার জন্য। এটা আমার বহুদিনের সাধ।

বানর খুব চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু সে নিরাশ হলো না। মনে সাহস আনল। সে তখন জ্ঞানী লোকের মতো বলল–আরে বন্ধু! তুমি একথা আমাকে আগে বলোনি কেন? আমি তো আমার কলিজাটা গাছে রেখে এসেছি।

কুমির বলল–এখন উপায়?

বানর বলল–আমাকে গাছের নিচে নিয়ে চলো। আমি আমার কলিজাটা নিয়ে আসি।

কুমির বানরের কথামতো যখন তাকে গাছের নিচে নিয়ে গেল, অমনি বানর আনন্দে লাফ দিয়ে গাছে উঠে গেল। কুমির তার আনন্দ দেখে জিজ্ঞাসা করলো, কী ব্যাপার! তুমি এত আনন্দিত কেন? কলিজা নিয়ে নেমে এসো।

বানর বলল–আরে বোকা কুমির! কলিজা কি কখনো গাছে রাখা যায়? সেটাতো আমার সাথেই ছিল। সুতরাং তুমি চলে যাও। আর কোনো দিন আমার সাথে খাতির দেখাতে এসো না।

শিক্ষা : *দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথা কাছে বসে এসে,*
মিষ্টি-মধুর কথা বলে প্রাণে মারে শেষে।

অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ

এক ছিল কৃষক। তার বাড়ির গোলাঘরের গর্তে বাস করত এক ইঁদুর। ইঁদুরটি ছিল ভীষণ দুষ্ট। কৃষকের স্কুলপড়ুয়া ছেলের সেল্‌ফের বইগুলোর তার কাছে কোনো মূল্যই ছিল না। মূর্খ ইঁদুরের কাছে এগুলো হচ্ছে কুটি কুটি করে কাটার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু মাত্র। তাই সে মনের আনন্দে সেগুলো কেটে ফেলে।তেমনি করে কৃষকের ফসল এবং কাপড়ের সৌন্দর্যও তাঁর সুদন্তগুলোকে ভীষণ আকৃষ্ট করে। তাই সুযোগ পেলেই সেগুলো টুকরো করতে ইঁদুরটি উঠে পড়ে লেগে যায়। এতে করে কৃষকের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে ইঁদুরটির উপর। সে ইঁদুর নিধনের চেষ্টা করে যেতে লাগল।

এবার ইঁদুরটির টনক নড়ল। সে বুঝতে পারল–এ বাড়িতে তার সময় শেষ হয়ে আসছে। তাই সে পালাবার ফন্দি আটতে লাগল।

একদিন সে দেখল–একটি হাঁস তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সেই ইঁদুরটি দৌড়ে গেল হাঁসের কাছে। সে হাঁসকে বলল, কেমন আছো হাঁস ভাইয়া?

'ভালই আছি। তা বাপু! তুমি কেমন আছো?'–হাঁস বলল।

ইঁদুরটি তখন মুখ গোমড়া করে বলল–'আমার আর ভাল থাকা! বেঁচে থাকতে কী যে কষ্ট হচ্ছে, তা তোমাকে বুঝাতে পারব না।' এই বলে সে

ইনিয়ে বিনিয়ে তার দুঃখের কাহিনী বলে হাঁসের মন গলিয়ে ফেলল। পরিশেষে সে টোপ ফেলে বলল, 'ভাই! এখানে না খেয়ে থেকে তো আর পারছি না! তুমি যদি দয়া করে আমাকে নদীর ওপারে পৌঁছে দাও, তবে খেয়ে পড়ে আমিও বাঁচব, তোমার জন্যও দোয়া করব।

হাঁসটি রাজি হয়ে ইঁদুরকে পিঠে নিয়ে নদীতে ভাসল। এক সময় কথা বলতে বলতে ওপারে পৌঁছে গেল। ইঁদুরটি ওপারে পৌঁছেই একছুটে চলে গেল। হাঁসটি পাখা ঝাড়া দিয়ে সোজা হল। কিন্তু হায়! একি হল তার! সুন্দর পালকগুলো ঝুর ঝুর করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল দুষ্ট ইঁদুরের সাথে বন্ধুত্বের পরিণাম। ইঁদুর তার কুট কুট করে কেটে ফেলার স্বভাব তার উপকারী বন্ধু হাঁসের সাথেও করে বসল! এভাবে ইঁদুর হাঁসের অমূল্য সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দিল।

হাঁস যখন দেখল–ইঁদুরটি তার শরীরের সুন্দর আবরণকে কুটি কুটি করে কেটে ফেলেছে, তখন হাঁসটি কান্নায় ভেঙে পড়ল। আর ভাবতে লাগল–তার এ কুৎসিত আকৃতি নিয়ে কিভাবে আজ তার স্বজনদের কাছে যাবে?

শিক্ষা : *সৎ সঙ্গ স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ।*

সোজা শ্বশুর বাড়ি

আনিস বোকা ধরনের মানুষ। সে বিয়ে করেছে বেশ কয়েক বছর হলো। কিন্তু আজও শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না তার। একদিন তার ঘাড়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ভূত চাপলো। যদি মরে যায়, তবে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আর হবে না।

আনিস শ্বশুর বাড়ির পথ চেনে না, তাই মায়ের কাছে পথনির্দেশ নিতে গেল। মা হাত ইশারায় বললেন, এইভাবে সোজা যাও...।

মায়ের দেখানো সোজা পথে সে যাত্রা শুরু করল। ও পথ চলছে একদম সোজা, এক চুলও এদিক ওদিক ঘুরছে না। যদি শ্বশুর বাড়ির পথ হারিয়ে যায়?

অনেক দূর যাবার পর পথ অন্য দিকে ঘুরে গেছে। তবে তাকে তো ঘুরলে চলবে না। তাই ও সোজা নিশানা বজায় রেখে পথ থেকে নেমে পড়ল। কিছুদুর গিয়ে সামনে একটা দীঘি পড়ল। কেমনে এবার সোজা যাবে আনিস? দীঘি ঘুরে ওপাশ দিয়ে গেলে তো পথ হারিয়ে যাবে। না, সোজাই যাবে সে। সে দীঘিতে নেমে সাঁতরিয়ে সোজা ওপারে উঠল। একটু জিরিয়ে গায়ের পানিগুলো শুকিয়ে নিল। আবার সোজা চলা শুরু করল সে। এবার আনিসের সামনে পড়ল একটি গরুর পাল। একটু ঘুরে গেলে হয়, কিন্তু মা যে বলেছেন, 'এইভাবে সোজা যাও...'। সে গরুর পালের মধ্যে প্রবেশ করে যথাসম্ভব গরুদের সরিয়ে সোজা যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু একটা বদমেজাজী গরু আনিসের এ বাদশাহী চলা পছন্দ করল না। গরুটা তেড়ে এসে তাকে বেশ করে গুতিয়ে দিল।

একপাশে পড়ে আনিস ভাবল–সোজা যাওয়া তো খুব কষ্টের ব্যাপার! তবে এতদূর যখন এসেছি, তখন যে করেই হোক সে শ্বশুরবাড়ি যাবিই। নিরাশ না হয়ে সে আবার সোজা চলা শুরু করল।

মাঠ ছাড়িয়ে সে এক বনে এসে পড়ল। আনিসের সোজা নিশানার সামনে পড়ল মস্ত বড় এক তাল গাছ। এখন তো মহাবিপদ! তাল গাছকে ডিঙ্গিয়ে কিভাবে যাবে সে? আবার গাছ ঘুরে গেলে তো পথ হারিয়ে যাবে, শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হবে না। সোজা পথ চলায় এত বাধা। না ! আজ তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে। সে দেখেশুনে সোজা গাছ বেয়ে উপরে ওঠা শুরু করল। উপরে উঠে আবার অপর পাশ দিয়ে নামলে, সোজা পথ বজায় থাকবে তার।

কিন্তু গাছের মাথায় উঠে সে এক গ্যাঁড়াকলে পড়ল। অপর পাশ দিয়ে পাতা ধরে নামতে গিয়ে তার দুই পা গাছ থেকে ফসকে গেল। হাতে ধরা থাকল গাছের পাতা। পাতার ডগা খুব লম্বা হওয়ায় আনিস পা দিয়ে কোনোমতেই গাছের নাগাল পেল না। এখন উপায়? এত উঁচু থেকে পড়লে তো নির্ঘাত শ্বশুরবাড়ি বউসুদ্ধ হারাতে হবে। তাছাড়া এভাবে ঝুলে থাকাও

বা কতক্ষণ যায়, সে পড়ল মহাবিপাকে। তবে কি আনিসের শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-ই হবে না?

সহসা সে কিছুদূরে চেয়ে দেখে, এক গায়ক গজল গেয়ে হাতির পিঠে চড়ে যাচ্ছে। আনিস তার উদ্দেশ্যে সজোরে চিৎকার শুরু করল। অবাক কাণ্ড দেখে গায়ক গাছের কাছে এলো। সে আনিসের ঝুলে থাকা বরাবর নিচে হাতিটা দাঁড় করালো তাকে নামানোর জন্য। যেই সে আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে আনিসের পা দুটো ধরল, ঠিক সেই মুহূর্তে এক আজব ঘটনা ঘটে গেল। আঙ্গুলের চাপে পিঠে ব্যথা পেয়ে হাতি দিল দৌড়। আর গায়ক অগত্যা আনিসের পা ধরে ঝুলে রইল। ফলে আনিসের বিপদ বেড়ে গেল। সে ভাবছে–ছিলাম একা, তাকে ডেকে বিপদ ডবল হলো। গায়ক চিন্তা করছে, একে বাঁচাতে কেন মরতে এলাম?

দু'জনের ভার আনিস আর কতক্ষণ রাখতে পারে? দারুণ দৃশ্য, গায়ক ঝুলে আছে আনিসের দু'পা ধরে, আর আনিস ঝুলে আছে তালপাতা ধরে। ছেড়ে দিলেই দু'জনের শ্বশুরবাড়িসহ সবই হারাতে হবে।

হঠাৎ আনিস বলল–'গায়ক ভাই গজল শুরু কর, দেখ কেউ আসে কিনা।' বুদ্ধিটা মন্দ নয়। গায়ক সুরেলা গলায় গজল টান দিল। সুরের মূর্ছনায় পরিবেশ বিমোহিত হয়ে গেল। গজল শুনে আনিসের কষ্ট লাঘব হতে শুরু করল। ক্রমে গজলের সুরে আনিস এমন আত্মহারা হয়ে গেল, সে ভুলে গেল যে, তারা গাছে ঝুলে আছে। আনিসের মনে নেই যে, সে পাতা ধরে ঝুলে আছে এবং তার পায়ে ঝুলে আছে আরেকজন। মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে উঠল-'তোমার গলায় এত সুন্দর সুর!' সেই সাথে আবেগের আতিশয্যে 'সাবাস' বলে জোরে হাতে তালি দিল আনিস। এর পর কী হলো? এক জোড়া তাল পড়ল! মানে গাছ থেকে ওরা দু'জন ধপাশ...!

শিক্ষা : *সোজা চলার মানে বুঝতে হয়। এত বোকা হলে কি বিয়ে করা সাজে?*

উল্টাটাই মোজা

জনৈক সাহিত্যিকের সাথে দেখা করার জন্য এক লোক গেলেন ভারতের এক প্রদেশে। তিনি এর আগে কখনো সে দেশে যাননি। তাই রাস্তাঘাটও চেনেন না। বাসে উঠে ভাবতে লাগলেন–নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিকমতো নামতে পারবেন কি না? তাঁর পাশেই বসা এক ছেলে। দেখে মনে হচ্ছে শিক্ষিত। তাকে বললেন, ভাই! আমি অমুক স্থানে নামব। সেই জায়গাটা এলে আমাকে একটু বলে দেবেন? ছেলেটি মুচকি হেসে কিছু না বলে মাথা ডান-বাম করল। বুঝল সে 'না না' করছে। লোকটি বলতে লাগলেন–দেখুন, আমি এদেশে নতুন, রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না। তাই আপনাকে বলছি। সে আবারও হেসে মাথা ডান-বাম করল। লোকটি তো অবাক, ছেলেটির একটু ভদ্রতাও নেই। কিভাবে হেসে হেসে না করছে! তিনি যতই অনুরোধ করতে লাগলেন, ছেলেটি ততই হেসে হেসে মাথা ডান-বাম করতে লাগল। শেষে লোকটি অনেক রেগে গিয়ে সিট থেকে উঠে পড়লেন। ভাবলেন–কী বেয়াদব! কিছু না বলে দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নির্দিষ্ট স্থান এসে পড়লে সাইনবোর্ডে নাম দেখে যখন নামার উদ্যোগ নিলেন, তখন ছেলেটি এসে বলল–'আপনার স্টপেজ এটাই।' এবার আর রাগ সামলাতে পারলেন না। রাগান্বিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন–'তাতো দেখতেই পাচ্ছি। এতক্ষণ টেনশনে রেখে এখন ভদ্রতার কী প্রয়োজন ছিল?' নামার পর বাস ছেড়ে দিল। দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলেটি রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাস চলে গেলে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরলেন। কাঙ্খিত সাহিত্যিক তাকে দেখে বললেন–'এতদূর থেকে এসেছেন, এখন বিশ্রাম নিন। রাতে কথা হবে।'

দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে লোকটি বিকেলে হাঁটতে বেরুলেন। একটা হোটেল দেখে সেখানে বসলেন। এমন সময় সাহিত্যিকের বড় ছেলে এলো কয়েকজন বন্ধু নিয়ে। পরিচয়পর্ব শেষ হলে তাদেরকে চা খেতে বললেন–সবাই হেসে মাথা ডান-বাম করল। 'আরে খাওনা, আমি খুব খুশি হব।' তারপরও তারা

মাথা ডান-বাম করতে লাগল। দু'-তিনবার বলার পরও যখন তারা মাথা দুলিয়ে যাচ্ছে, তখন আর কিছু বললেন না। ভাবলেন–এরা যখন খেতে চাচ্ছে না, থাক। কী দরকার বিদেশ বিঁভূইয়ে এসে শুধু শুধু টাকা-পয়সা খরচ করার? শেষে নিজেই এক কাপ চা খেয়ে চলে এলেন।

রাতের বেলা সাহিত্যিকের সাথে আলোচনায় বসলেন। কথা বলার সময় লোকটি লক্ষ্য করলেন–সাহিত্যিক বারবার মাথা ডান-বাম করছেন। তা দেখে থেমে গেলেন বাংলাদেশী লোকটি? সাহিত্যিক বললেন–'কী ব্যাপার, থেমে গেলেন কেন? বলুন।'

: আপনার বোধ হয় আলোচনা ভাল লাগছে না?

: না, না, খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে। হঠাৎ এ ধারণা হলো কেন আপনার?

: না, মানে আপনি বারবার মাথা দুলিয়ে না করছেন তো, তাই ভাবলাম...।

একথা শুনে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন সাহিত্যিক। মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা। কিছুক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন–আপনাকে আগেই বলা উচিত ছিল। আসলে অন্যান্য এলাকায় যেমন মাথা ডান-বাম করে না বুঝানো হয়, আমাদের এখানে হয় এর উল্টো। অর্থাৎ মাথা ডান-বাম করে আমরা হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকি।

ব্যাখ্যা শুনে তো সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকের আক্কেল গুড়ুম। সাথে সাথে মনে পড়ল বাসের ছেলেটির অবাক চাহনি আর বিকেলে সাহিত্যিকের ছেলের বন্ধুদেরকে চা-এর দাওয়াতের কাহিনী। আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনিও হাসতে লাগলেন।

পরদিন ছেলের বন্ধুদেরকে ডেকে এনে বিষয়টা খোলাসা করে আরেক দফা হাসাহাসি করলেও বাসের ছেলেটিকে আর পাওয়া গেল না। সে হয়তো আজীবন অবাক হয়েই থাকবে।

শিক্ষা : *এক দেশের গালি, আরেক দেশের বুলি।*

কুকুর নাকি বকরী

জনৈক ব্যক্তি একটি বকরী পালতো। সেটির প্রতি ছিল তার অগাধ ভালবাসা। সে ছিল অত্যন্ত সহজ সরল, নম্র ভদ্র। অভাবের তাড়নায় একদিন সে বকরীটি বিক্রি করার জন্য হাটের দিকে রওনা দিল।

এদিকে একই গ্রামে বাস করত তিন ধোকাবাজ। তারা যখন ভদ্রলোকটির বকরী বিক্রির কথা শুনতে পেল, তখন উপস্থিত পরামর্শের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, আমরা যে করেই হোক বকরীটি চাই। এরই মধ্যে তারা নিজ নিজ দলবলসহ স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত হয়ে গেল।

ভদ্র লোকটি অতি আদরের বকরীটি রশি টেনে এগিয়ে চলছে হাটের দিকে। কিছুদূর না যেতেই দেখা হল এক ধোকাবাজের সাথে। ইতোমধ্যে তাদের মাঝে সালাম-কালাম ও পরিচয়পর্ব শেষ হল। এরপর ধোকাবাজটি বলল–চাচা! কোথায় যাচ্ছেন?

: বাবা! অভাবের কারণে বকরীটি বিক্রি করার জন্য হাটে যাচ্ছি।

: কি বললেন, বকরী? কই আপনার হাতে তো দেখছি একটি কুকুর। একথা বলেই সে খুব মজা করে হাসতে শুরু করল।

এতে ভদ্রলোকটি ভীষণ অবাক হল। কি বললে? আমি নিয়ে যাচ্ছি বকরী, আর তুমি বলছ এটা কুকুর?

এরপর সে একটু সামনে এগুতেই দেখা হলো আরেক ধোকাবাজের সাথে। তার সাথেও তেমনই কথোপকথন হলো এবং সেও ওটাকে কুকুর বলে অট্টহাসি হাসল।

আবার ভদ্র লোকটি দুরুদুরু মনে হাঁটিহাঁটি পা পা করে সামনে এগুতে দেখা হল ধোকাবাজ সরদারের সাথে। আগের দু'জনের মতো তার সাথেও কথাবার্তা হলো। কিন্তু ভদ্রলোকটি তার বকরী বিক্রির কথা বলতেই লোকটি হাসতে হাসতে মাটিতে লুটে পড়ল এবং তার দলবল সকলে তার হাসির সঙ্গী হল। হাসির এক পর্যায়ে সে বলল–আপনি কুকুর নিয়ে যাচ্ছেন, আর বলছেন কিনা বকরী?

ভদ্রলোকটি পর পর তিনজনের মুখে নিজ পোষ্য বকরীটা কুকুর হওয়ার কথা শুনে দিশেহারা হয়ে ভাবতে লাগলেন–তাহলে কি আমি ঠিকই কুকুর নিয়ে বাজারে যাচ্ছে? হয়তো তাই। নইলে এতগুলো লোক কি মিথ্যে বলবে? এ কথা বলে লোকটি বড় আদরের বকরীটি ছেড়ে দিয়ে নিজেকে বোকা মনে করে বিষন্ন মনে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। তখন তিন ধোকাবাজ মিলে বকরীটি ধরে জবাই করল এবং সুস্বাদু খানা তৈরি করে তৃপ্তিভরে খেল।

শিক্ষা : *হাজার মানুষ বললেও দিন কখনো রাত হয় না। তাই উপযুক্ত যাচাই ছাড়া শুধু মানুষের কথায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।*

যাকে বলে বোকা

জনৈক বোকা লোক গাছের আগার দিকে বসে গোড়ার দিকে কোপাতে লাগলো। লোকটির এই বিপদজনক কাজ দেখে এক মুরব্বী রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকার করে বলতে লাগলেন-এই! তুই মরেছিস! তুই মরেছিস!!

এই চিৎকার শুনে লোকটি গাছ থেকে নেমে এলো। মুরব্বীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, হুজুর! আমি কি সত্যি মরে গেছি? মুরব্বী ভাবলেন, এই লোকটিকে বুঝানো সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি লোকটির কথার কোনো জবাব না দিয়েই চলে গেলেন।

লোকটি ভাবলো, মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায় না, সম্ভবত এই জন্য মুরব্বী আমার কথার জবাব না দিয়েই সরে পড়েছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে আমি মরে গেছি। এই ভেবে লোকটি পাড়ার সবাইকে হাত জোড় করে অনুরোধ করে বেড়াতে লাগলো–আপনারা আমার কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, আমি মরে গেছি।

কিন্তু তার কথায় কেউ সাড়া দিল না। অগত্যা সে নিজেই একটি কোদাল সংগ্রহ করলো এবং নদীর ধারে গিয়ে কবর খুঁড়তে লাগলো। কবর

খোঁড়া শেষ হলে কোদালটি রেখে কবরের ভেতরে মরার মত পড়ে থাকল।

ঐ নদী দিয়ে লঞ্চ যাতায়াত করতো। একটি লঞ্চ এসে এক সাহেবকে নদীর ঘাটে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। সাহেব সরকারী চাকরি নিয়ে ঐ গ্রামে এসেছিলেন কী একটা কাজের তদারক করতে। তিনি ডাক বাংলোয় যাবেন। সঙ্গে রয়েছে বিছানাপত্র ও একটি বাক্স। কিন্তু কে বয়ে নিয়ে যাবে এগুলো? আশেপাশে কোনো লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। অবশেষে দূরে চোখে পড়লো একটি কোদাল। সদ্য মাটি কাটা হয়েছে, কোদালটি এখনও সরানো হয়নি। ভাবলেন–মাটি কাটা লোকটি আশেপাশে নিশ্চয় কোথাও আছে।

কোদাল লক্ষ্য করে সাহেব অগ্রসর হলেন। দেখেন–সেখানে একটি গর্ত। গর্তের মধ্যে একটি লোক শুয়ে আছে। সাহেব তাকে ডাকলেন, এদিকে এসো! লোকটি ভাবলো, আমি যে মরে গেছি, হয়তো এই ভদ্রলোক জানেন না। তাই আমার সাথে কথা বলতে এসেছেন। সুতরাং লোকটি কোনো সাড়া দিল না। পিঠ টান করে চুপ করে শুয়ে তাকাতে লাগলো।

ভদ্রলোক কয়েকবার ডাকলেন। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে বিরক্ত হয়ে কাছে গিয়ে তার কোমরে এমন জোরে এক লাথি মারলেন যে, লোকটি তড়িৎ উঠে বসে পড়লো। লোকটি ভাবলো, কবরের মনকির-নাকীর হবে। এর কথা অমান্য করা যাবে না। যা বলবে তাই শুনতে হবে। সাহেব যখন বললেন, আমার সঙ্গে এসো। লোকটি তার সঙ্গে সঙ্গে নদীর ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালো। সাহেব ওর মাথায় বাক্স ও বিছানাপত্রের পোটলাটি চাপালেন এবং একটি মিষ্টির হাঁড়ি ছিল সেটাও হাতে দিয়ে বললেন, চলো।

এই বলে সাহেব ওকে নিয়ে ডাক বাংলোয় পৌঁছলেন। ওর মাথা থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে ওকে আট আনা পয়সা দিলেন। আর মিষ্টির হাঁড়ি থেকে দুইটি রসগোল্লা হাতে দিয়ে বললেন, যাও।

লোকটি দৌড়ে এসে পাড়ায় প্রচার করতে লাগল, কবরে কী ঘটে আমি দেখে এসেছি। যা ঘটে তা হলো, একজন মনকির-নাকীর বুট জুতা পায়ে এসে এমন জোরে কোমরে এক লাথি মারে যে, মৃত ব্যক্তি শোয়া থেকে উঠে বসে

পড়ে। তারপর তার সাথে কিছুদূর গিয়ে সেখান থেকে বাড়িতে নিয়ে বোঝা নামানোর পর বিদায় করে দেওয়া হয়। আর দেওয়া হয় দুইটি রসগোল্লা।

শিক্ষা : *আজকাল অনেক বুদ্ধিজীবী আছেন–যারা এই বোকার মতো ঘটনা পর্যবেক্ষণের দাবি করে আলেমগণের উক্তিকে হালকাভাবে নিয়ে বিচার করে থাকেন। এরপরও কি তাদের বুদ্ধিজীবী বলা যায়?*

কানে কম শোনার কারণে

জনৈক বধির লোকের একটি বকরীর খোয়াড় ছিল। সে খোয়াড়ে অনেক বকরী পালত। একদিন হঠাৎ করে তার বকরীগুলো খোয়াড় থেকে বের হয়ে একদিকে চলে গেল। তখন সে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বকরী না পেয়ে সে গ্রামের বাইরে বকরী খুঁজতে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে সে এক পথিককে জিজ্ঞাসা করল, ভাই! আমার একদল বকরী হারিয়েছে, আপনি কি আমার বকরীগুলো দেখেছেন? ঐ লোকটিও ছিল বধির, মানে কানে কম শোনে। তখন লোকটির কথা সে শুনতে না পেয়েও ঐ রাস্তায় চলে গেল এবং সে প্রতিজ্ঞা করল যে, যদি আমি সত্যিই বকরী পাই, তাহলে আমি ঠেং ভাঙা বকরীটি তাকে উপহার দেব।

লোকটি কিছুদূর যেতেই তার বকরীর দলটিকে পেয়ে গেল। এবার তার ঠেং ভাঙা বকরীটি তাকে দিতে গেল। এখন সে তার উপঢৌকন দেওয়ার কথা শুনতে না পেয়ে বলছে, ভাই! আমি তোমার বকরীর ঠেং ভাঙি নাই। তখন বকরীওয়ালা বলল, তোমার এই বোকরীটি নিতেই হবে। আবার লোকটি বলল–না, আমি বলছি তোমার বকরীর ঠেং ভাঙি নাই। এভাবে দুই বধিরের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। এর মধ্যে আরেক বধির লোক ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা দু'জনে ঘোড়ার লাগাম ধরে সব ঘটনা তাকে বলতে লাগলো। ঘোড়ার পিঠে সাওয়ার লোকটি তাদের কথা না শুনতে পেয়ে বলল–না ভাই, এটা আমার মাদি ঘোড়া থেকে

হয়েছে। এক পর্যায়ে তাদের তিনজনের মধ্যে ঝগড়া চলতে লাগল।

তাদের ঝগড়া দেখে সবাই মনে করল, গ্রামের বড় মাতব্বরের কাছে যেতে হবে। এর মধ্যে সেই দিন মাতব্বর সাহেব তার বউকে মেরে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছেন। তিন বধিরই তাদের সব ঘটনা খুলে বলল। এদিকে মাতব্বরও ছিলেন বধির, কিছুই শুনতে পান না। মাতব্বর সাহেব বললেন–তোমরা আমার বউয়ের পক্ষ থেকে এসেছ তাই না? তোমরা যদি আমাকে ঘোড়া-বকরী দাও, তবুও আমি বউকে আর আমার ঘরে আনব না।

শিক্ষা : *দেখলে তো! আল্লাহ যাকে শ্রবণশক্তি দেননি, তার অবস্থা কেমন হয়? তাই আমাদের উচিত, তার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা।*

একশ' মোহরের লোভে

একদিন এক রাজা ছদ্মবেশে রাজ্য দেখছিলেন। হঠাৎ এক বাড়ি থেকে গজলের আওয়াজ শুনতে পেলেন। রাজা গজলকে খুব ভালবাসতেন, তাই সেই বাড়িতে গজল শুনতে গেলেন। রাজা দেখলেন একটা ছোট ছেলে মধুর কণ্ঠে গজল গাইছে। রাজা মনে মনে খুব খুশি হলেন। যখন ছেলেটি গজলে টান দিল, রাজা আরও তৃপ্তি পেলেন। গজল শেষে রাজা ছেলেটিকে একটি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলেন।

রাজা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ছেলেটির লোভী পিতা ছদ্মবেশী রাজাকে না চিনে বলল–এই যে বেটা! আমার ছেলের গান শুনতে কমে একশ' মোহর লাগে। বাকি মোহর কোথায়? রাজা বললেন–আমি গজল শুনে আনন্দ পেয়েছি, তাই পুরস্কারের কথা শুনিয়ে আনন্দ দেব। চলুন আমার সাথে।

লোকটি একশ' মোহরের আশায় রাজার বাড়ির দিকে এগুতে লাগলো। পথের মধ্যে সে রাজাকে বলল-আমি একশ' মোহর পেলে কি করব জানেন? রাজা বললেন–না বললে কিভাবে জানব? সে বলল–আমি একশ' মোহর পেলে রাজার মেয়েকে বিয়ে করবো। রাজা মুচকি হেসে বললেন–তাই

নাকি? আর কি করবেন? লোকটি বলল–আরো অনেক কিছু করবো, সব কি আর সবার কাছে বলা যায়?

রাজার সঙ্গে মজার গল্প করতে করতে রাজবাড়ির সামনে পৌঁছে লোকটি বলল–আমার পাওনা দিয়ে দাও। রাজা বললেন–আপনাকে একটি পুরাতন মোহর দিয়েছিলাম, সেটা ফেরত দিন। লোকটি ভাবল–সেটা ফেরত নিয়ে একশ' মোহর দিবেন বুঝি। তাই খুশি মনে মোহরটা দিয়ে দিল। রাজা বললেন–আমি আপনার ছেলের গান শুনে যে আনন্দ পেয়েছি, আপনাকে পুরস্কার দেব বলে সে আনন্দ দিয়েছি। অর্থাৎ আপনার ছেলে আমাকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছে, আর আমি আপনাকে পুরস্কার দেব বলে আনন্দ দিয়েছি। সুতরাং শোধবোধ হয়ে গেল। লোকটি মাথায় হাত দিয়ে আফসোস করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল।

শিক্ষা : *বেশি খেতে চাইলে কমের নাগালও পাওয়া যায় না।*

বাদশাহর পরীক্ষা

এক রাখাল মাঠে কাজ করছিল, এমন সময় সুসজ্জিত এক লোক এলো। তার আপাদমস্তক স্বর্ণ, হিরা-জহরত ও মনি-মুক্তায় ভর্তি। লোকটি এসে রাখালকে বলল, এই ছেলে! আমার একটি ঘরে আশ্রয়ের প্রয়োজন। তুমি যদি সব কাজ ফেলে আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে যাও, তাহলে আমার দেহের এসব কিছু তোমার হয়ে যাবে।

এ কথা শুনে রাখাল খুশিতে রাজি হয়ে গেল। তারপর জামিদারের কাছে বিদায় নিতে গেল। বলল, আমি আর আপনার কাছে থাকব না। জমিদার জিজ্ঞাসা করল, তাহলে তুমি খাবে কী? থাকবে কোথায়? রাখাল ঐ লোকটিকে দেখিয়ে বলল, ঐ যে লোকটা দেখছেন, তার সম্পদেই চলে যাবে আমার জীবন। সে বলেছে–আমি তাকে আশ্রয় দিলে, তার ঐ স্বর্ণ-মুক্তা, হিরা-জহরত সব আমাকে দিয়ে দেবে।

লোকটির দিকে তাকিয়ে জমিদারের লোভ হল। রাখালকে বলল–এই বেয়াকুফ। তুই কি এমন দামী লোককে লালন-পালন করতে পারবি? তাকে

রাখার মতো যোগ্যতা তো একমাত্র আমারই আছে। কিন্তু রাখালও ছাড়ল না। এভাবে জমিদার ও রাখাল তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত তা গড়াল থানার দারোগা পর্যন্ত।

দারোগার কাছে গিয়ে তারা সবকিছু খুলে বলল। এবার দারোগা সাহেবও ঐ সোনা-দানা দেখে লোভে পড়ে গেল। কিসের বিচার করবে, বরং আরো বলল, আরে বেয়াকুফ! তোদের এই দামী লোকটাকে লালন-পালন করার ক্ষমতা কোথায়? তাকে লালন-পালনের ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। তারাও নাছোড়। এবার শুরু হল তিনজনের মধ্যে ঝগড়া। তখন তারা নিরুপায় হয়ে জজ সাহেবের কাছে গেল।

কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। জজ সাহেব স্বর্ণ-হিরা ও মণি-মুক্তার ঝলক দেখে বলল, দেখো আমার ইশারায় অনেক মানুষ ফাঁসিতে ঝুলে। আবার আমার ইশারায় হাজার মানুষ ফাঁসি থেকে মুক্তি পায়। আমি থাকতে তোমরা কেন এমন গুরুত্বপূর্ণ লোককে পালতে যাবে? তাকে তো আমি লালন-পালন করার বেশি সামর্থবান।

এবার শুরু হল চারজনের মধ্যে ঝগড়া। ফয়সালার জন্য তারা গেল প্রধানমন্ত্রীর কাছে। প্রধানমন্ত্রী ঐ লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখে বলল, এত স্বর্ণ-মাণিক্য তো আমি জীবনেও দেখিনি। মনে মনে ভাবল–আর যাই কিছু হোক, তাকে হাতছাড়া করা যাবে না। এই ভেবে প্রধানমন্ত্রী বলল, আমি থাকতে তোমরা? না, এ কিছুতেই হতে পারে না। চলে যাও তোমরা। এই লোকটা থাকবে আমার কাছে।

এবার শুরু হল পাঁচজনের তর্ক-বিতর্ক। কেউ কাউকে ছাড় দিতে চায় না। সবাই চায় লোকটিকে নিজের করে নিতে। কিন্তু এখন তাদের এ সমস্যার সমাধান কে দেবে? তাদের ঝগড়া যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছল, তখন সেই লোকটি বলল–আচ্ছা, তোমরা ঝগড়া করো না। আমিই সমাধান দিচ্ছি কে আমাকে নেবে? আমি এখান থেকে দৌড় দেব। যে আমাকে আগে ছুঁইতে পারবে, সে-ই আমাকে পাবে।

একথা শুনে রাখাল ভাবল–আমি তো সারাদিন গরুর পেছনেই দৌড়াদৌড়ি করি। আমিই সবার আগে তাকে ছুঁইতে পারবো। জমিদার

ভাবল–ছোট কালে কত দৌড় দিয়েছি, কিন্তু এখন কি আর পারা যাবে? যাক, আমি মনে করব ছোটই আছি। কোনো রকমে যদি এই লোকটাকে ছুঁইতে পারি, সারাজীবনই বসে খেতে পারব। আর দারোগা সাহেব ভাবল–দারোগা হওয়ার জন্য ট্রেনিংয়ের সময় তো কত দৌড়াদৌড়ি করেছি। কিন্তু এখন তো হোন্ডা ছাড়া কথাই নেই। যাক, মনে করব আমি ট্রেনিং নিচ্ছি। সেই ভেবে এমন দৌড় দেব যে, সবার আগে তাকে ছুঁয়ে ফেলব। আর জজ সাহেব ভাবল–ছাত্রবেলা কতই না দৌড়াদৌড়ি করেছি। কিন্তু এখন তো আমি মাটিতেই পা রাখি না, গাড়ি দিয়ে কোর্টে যাই, আবার গাড়ি দিয়েই বাড়িতে আসি। যাক, মনে করব আমি এখনও ছাত্রই আছি। মরি আর বাঁচি, এই সম্পদওয়ালাকে আমার চাই-ই চাই। আর প্রধানমন্ত্রী ভাবল–আরে, আমার হাত-পা সব লম্বা। ওরা যতটুকু দৌড়িয়ে যাবে, আমি ততটুকু হেঁটেই যেতে পারব।

ইতোমধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। দৌড়াচ্ছে তো দৌড়াচ্ছেই। কেউ লোকটাকে ধরতে পারছে না। দৌড়াতে দৌড়াতে লোকটা শাহী মহলে ঢুকে গেল। সেখানে বাদশাহ বসে বসে এদেরই অপেক্ষা করছিলেন। ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনে বাদশাহ বললেন–আমি শুনে আসছি যে, আমার দেশের প্রশাসনের সর্বত্র লোভ আঁকড়ে ধরে দুর্নীতিতে দেশকে নিমজ্জিত করেছে। তাই আমিই পরীক্ষার জন্য এ লোকটাকে স্বর্ণ-মুদ্রা ও হিরা-মাণিক্যসহ পাঠিয়েছি অবস্থা যাচাইয়ের জন্য। এখন দেখছি, আমি যা ভেবেছিলাম অবস্থা তার চেয়ে বেশি ভয়াবহ। রাখাল, জমিদার, দারোগা, জজ ও প্রধানমন্ত্রী সবাই ভীষণ লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করে রইল এবং কাকুতি-মিনতি করে মাফ চাইতে লাগল। আর অঙ্গীকার করল–তারা জীবনে আর লোভ করবে না।

শিক্ষা : *আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও সময় সময় আমাদের ঈমান-আমলের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। আমাদেরকে সেই পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হতে হবে।*

বুদ্ধির জোরে

গ্রামের নাম দশমিনা। সেই গ্রামে বাস করে আব্বাস নামের এক কৃষক। তার কোনো ছেলে-মেয়ে নেই। সন্তান না থাকার ব্যথাটা তাকে সারাক্ষণ যেন আচ্ছন্ন করে রাখে। সংসারে লোক বলতে সে আর তার স্ত্রী। এক অমাবস্যার রাতে তারা তাদের সুখ-দুঃখের কথা আলাপ করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ভুলে গেল ঘরের দরজা বন্ধ করতে।

এদিকে পাশের গ্রামের কলিম চোরা অমাবস্যা রাতের অন্ধকারের সুযোগে বেরিয়ে পড়ে চুরি করতে। আব্বাসের বাড়ির কাছে এসে ঘরের দরজা খোলা দেখে সোজা সে ঢুকে পড়ে তাদের ঘরে। ঘরে ঢুকেই খাটের নিচের হাঁড়ি-পাতিল, এটা সেটা হাতড়াতে থাকে। যদি নগদ কিছু পাওয়া যায়!

হাঁড়িপাতিলের টুংটাং শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আব্বাসের। ঘুম ভাঙতেই সে বুঝে ফেলে, ঘরে চোর ঢুকেছে। চোর চোর বলে চিৎকার দিতে যাবে, অমনি খেয়াল হলো, যদি চোরের কাছে কোনো অস্ত্র থাকে? আর তা দিয়ে সে যদি আঘাত করে? আবার চোরকেও তো এমনিই ছেড়ে দেওয়া যায় না। এ ধরনের সাত-পাঁচ ভাবতেই তার মাথায় একটা সুন্দর বুদ্ধি উদয় হলো। বিড় বিড় করে সে বলতে লাগল–হায় আল্লাহ! ভাগ্যিস ঘুমটা আমার ভেঙেছে। ঘরের দরজা খোলা। কোন ফাঁকে চোর ঢুকে ঘরের সব জিনিসপত্র নিয়ে যেত।

কথাগুলো বলতে বলতে সে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। চোর বেচারা শব্দ বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে রইল। বিছানায় ফিরে আব্বাস স্ত্রীকে ডাকল–এই! শুনছো?

স্ত্রী ঘুমজড়ানো চোখে জবাব দিল–কী হলো? এতো রাতে আবার ডাকাডাকি করছো কেন?

ডাকছি কি আর সাধে? আজ রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্নের কথাটা শোন–বলে সে তার স্ত্রীর কানে কানে কী যেন বললো।

স্ত্রী বলল : বুড়ো বয়সে আবার কী স্বপ্ন দেখলে গো?

: দেখলাম তোমার একটা ছেলে হয়েছে। আর সেই ছেলের নাম 'চোর' রাখবো ঠিক করেছি।

: হায় আল্লাহ, বলে কি? ছেলের নাম কখনও চোর হয়?

: তা হয় না। কিন্তু আমি চোরই রাখবো ঠিক করেছি।

: তোমার যা খুশি, তা তুমি রাখতে পারো। কিন্তু আমি রাখবো ইবরাহীম।

: না, চোর।

: না, ইবরাহীম।

: চোর

: ইবরাহীম।

এভাবে ওরা ইবরাহীম আর চোর বলে চিৎকার শুরু করল। খাটের নিচে চোরটা বুড়ো-বুড়ির কথা কাটাকাটিতে কৌতুক অনুভব করে বেশ মজা পেতে থাকে। সেই সাথে ভাবতে থাকে–ওরা আরেকবার ঘুমুলেই সে তার আসল কাজটি সারবে।

ওদিকে পাশেই ছিল ইবরাহীম নামের এক লোকের বাড়ি। 'ইবরাহীম-চোর' শব্দগুলো তার কানে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল তার। আর যায় কোথায়! দরজা খুলে বেরিয়েই সে চিৎকার জুড়ে দিল 'চোর চোর' বলে। তার ডাকাডাকিতে মুহূর্তের মধ্যে পাড়ার আর সব লোকও জেগে গেল। সবাই 'চোর ধর' বলে ছুটে আসে আব্বাসের বাড়ির দিকে।

এতক্ষণে চোরের বোধোদয় হয়। সে ধরে ফেলে আব্বাসের চালাকি। আর কালবিলম্ব না করে সে খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে দরজা খুলে পালাতে চায়। কিন্তু ততক্ষণে লোকজন এসে গেছে। তার পালানো আর হলো না।

শিক্ষা : *বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করলে অনেক কঠিন কাজও সহজে করা যায়।*

ভণ্ডের পলায়ন

ভণ্ড ফকির। মানুষকে সে পথহারা করে চলছিল প্রতিনিয়ত। তার হোমড়া-চোমড়া অনেক ছিল। ভক্তও কম ছিল না। একবার তার এক ভক্ত তাকে দাওয়াত করল। ভক্তের স্ত্রী ছিল দীনদার। মহিলাটি ছিল খুবই বুদ্ধিমতি। সে ভণ্ড ফকিরের অসৎ চরিত্র সম্পর্কে জানত। তাই সে স্বামীকে দাওয়াত দেওয়ার কথা নিষেধ করলো। কিন্তু স্বামী জবাব দিল, 'আমি আমার ফকির বাবাকে দাওয়াত দেবই।' তারপর সে ভণ্ড ফকিরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এলো। ফকিরকে বাড়িতে রেখে ভক্ত বাজারে গেল। এই ফাঁকে ভণ্ড ফকির ভক্তের স্ত্রীর সাথে রসালাপ করতে চাইল। বাধ্য হয়ে স্ত্রী ভণ্ডকে তাড়ানোর জন্য কৌশল আঁটতে লাগলো।

এক ফাঁকে ভণ্ড ফকির ঘরে ঢুকে বলল–তুমি কী রাধছো? তখন মহিলা লাঠির অগ্রভাগ ধারালো করছিল। ভণ্ড বলল, কি গো! লাঠি ধারালো করছো কেন? মহিলা বলল, আমার স্বামী লাঠি ধারালো করতে বলেছেন। ভণ্ড ফকির বললো, কেন? মহিলা বলল, তা জানি না, তবে মনে হয় এটা দ্বারা তিনি এক ভণ্ড ফকিরকে গুতা দেবেন।

এ কথা বলে স্ত্রী আপন মনে কাজ করতে লাগল। আর এদিকে ফকির বাবা মনে মনে ভাবলো–এই লাঠি বোধ হয় আমাকে গুতা দেওয়ার জন্য ধারালো করা হচ্ছে। তাই লাঠিটি লুকানোর জন্য সে বলল–লাঠিটা একটু আমাকে দাও তো! মহিলাটি বলল–না, এটা দেওয়া যাবে না। তখন ভণ্ড ফকির মনে মনে বলল–এবার আমার রক্ষা হল। আমি আগে ভাগেই পালাই। এই বলে ফকির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভক্তের স্ত্রী বললো, ফকির বাবা! আপনি যাবেন না, এই নিন লাঠি। ভণ্ড ফকির থামলো না। বাঁচার জন্য দিল দৌড়।

এদিকে ভক্ত এসে দেখে–বাবা বাসায় নেই। তখন সে বললো, বাবা কোথায়? স্ত্রী উত্তরে বলল, সে আমার কাছে এই লাঠিটা চেয়েছিল। আমি

দেইনি বলে রাগ করে চলে গেলেন। স্বামী বলল, দাও লাঠিটা, আমি বাবাকে দিয়ে দেব। এই বলে তখন সে লাঠি নিয়ে দৌড়াচ্ছে আর বলছে–বাবা! বাবা! লাঠিটা নিন। ভণ্ড পেছনে তাকিয়ে দেখে–ভক্ত লাঠি নিয়ে তার পেছনে পেছনে আসছে। সে ভাবল–সত্যিই বুঝি আমাকে লাঠি দ্বারা গুতা দেবে। তাই সে আরো জোরে দৌড় দিল। তাকে আর পায় কে?

শিক্ষা : *দীনদার মহিলাদের দ্বারাও ইসলামের অনেক কাজ হয়।*

স্বার্থ ফুরালে কেটে পড়ে

কাকের বাসায় ডিম পাড়ে কোকিল। সন্দেহপ্রবণ কাক কয়েকটা নিজের ডিম ভেঙে ফেলে। তারপর বাকি ডিমে তা দেয়। ছোট কালো ছানা বের হয়। দেখতে কাকের মতই। বোকা কাক তা লালন-পালন করে বড় করে তোলে। ডাকতে শেখে বাচ্চা। বাচ্চা ডেকে উঠে কু-হু কু-হু। কাক তখন বাচ্চাটাকে ঠোকরিয়ে বের করে দেয়। এটাই কাক ও কোকিলের নিয়ম।

এ নিয়ম ভঙ্গ করে একটি কাক কু-হু কু-হু শুনেও বাচ্চাকে তাড়াল না। নিজের বাচ্চার মতোই তাকে লালন-পালন করতে লাগল। কাকের অনেক দিনের সাধ সে কোকিলের কু-হু কু-হু ডাক শিখবে। তারপর সে কণ্ঠে কোকিলকেও হারাবে।

কোকিল ছানা উড়তে শিখল। তবে বেশি নয়, এডাল থেকে ওডালে, এগাছ থেকে ওগাছে। আবার মনের সুখে ছোট্ট খুকির মতো আস্তে আস্তে সুমধুর গলায় ডেকে উঠে কু-হু কু-হু। বাসায় বসে কাক ভাবে–আহা! আর দু'টি দিন! আমি শিখবই তোমার ভাষা। তারপর সুমধুর কণ্ঠে গাইব–কা-কা... কা...। আসলে কাক কুহু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু কণ্ঠ থেকে বেরুল কা-কা।

প্রতিদিন কাক যা পায় এবং যা খায়, তার অর্ধেক নিয়ে আসে কোকিল

ছানার জন্য। কোকিল ছানা ইচ্ছামতো পেট পুরে খায়। তারপর কাকের বাসা থেকেই সে ডেকে উঠে কু-হু কু-হু।

কাকটি ছিল খুব চালাক। যখন ছানাটি ডাকত, তখন সে বাইরে বেরিয়ে যেত। সব পাখিকে ডেকে বলত–দেখ, সবাই দেখ! আমার বাচ্চাকে আমি কোকিলের ডাক শিখিয়েছি। আমি প্রমাণ করেছি যে, ইচ্ছা করলেই উপায় হয়।

কয়েকদিন কেটে গেল। কোকিল ছানা আরও বড় হল। ভাল করে উড়তে শিখল। তার কণ্ঠের সুর আরো মধুর হল। সে একটি বড় ডালে গিয়ে উড়ে বসল। তারপর ডেকে উঠল কু-হু কু-হু। এবার কাক গেল কোকিলের কাছে। মনে মনে সে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল কি বলবে। সে বলবে–

"কোকিল ছানা কোকিল ছানা
যেমন তোমার কণ্ঠ বাহ,
আমায় তুমি দাওনা একটু
কা.....কা..... কা..... ।"

কিন্তু হলো না। কোকিলের কাছে যেতেই কোকিল সে ডাল থেকে অন্য ডালে চলে গেল। কাক বলল–বোকা ছানা! আমিই তো তোর মা। আমাকে দেখে কেন ভয়? তারপর কাক ভাবে–হয়ত জ্ঞান হয়নি পুরো।

আরো কিছুদিন পার হল। এবার একটা কিছু ঘটাবেই কাক। তাই কাক উড়াল দিয়ে গেল এক কৃষকের বাড়িতে। এক টুকরো গোশত চুরি করে নিয়ে এলো কোকিল ছানার জন্য।

বাসায় এসে পৌঁছল কাক। কিন্তু একি! বাসা শূন্য। পাশের গাছের ডালে খোঁজ নেয় সে। কোথাও সে কোকিল ছানাকে খুঁজে পেল না। কাকের আর বুঝতে বাকি রইল না যে, কোকিল ছানা বড় হয়েছে, উড়তে শিখেছে। এখন নিজের খাবার নিজেই খুঁজে বের করতে পারবে। কী আর করা। কাক মনের দুঃখে প্রতিজ্ঞা করল–আর কোনোদিন কোকিল ছানা পুষবে না।

শিক্ষা : *বিজাতিকে যতই বন্ধু ভাবা হোক, তারা কখনো প্রকৃত বন্ধু হতে পারে না। তারা স্বার্থ ফুরালে কেটে পড়ে।*

অলসতার কারণে

এক গ্রামে বাস করতো তিনজন কুড়ে লোক। কাজ-কর্ম করতে ভীষণ কষ্ট বোধ করত তারা। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বোকারাই সারা জীবন গাধার মতো খেটে মরে। বাপ-দাদার সম্পত্তি অঢেল, সেজন্য চাকরি বা ব্যবসা করারও প্রয়োজন ছিল না তাদের কারো। কোনো চিন্তা নেই , শুয়ে বসে জীবন কাটানো, আনন্দ উপভোগ করাই ছিল তাদের কাজ। ফলে বিশ্বসেরা অলস হিসেবে তাদের নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে।

তিন কুড়ের মধ্যে দারুণ বন্ধুত্ব। কাজ-কর্মে মন না থাকলে কি হবে, তিনজনেরই প্রখর বুদ্ধি। বুদ্ধি ও চাতুর্যে কেউ কারো চেয়ে কম নয়। একদিন তিন বন্ধু মিলে দূরের এক গ্রামে যাচ্ছিল। অলস, মন্থর পায়ে খোশগল্প করতে করতে হাঁটছিল তারা। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তিন বন্ধু অবাক। আশ্চর্য ব্যাপার তো! এত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে গেল? যে গ্রামে তারা যাবে, সে গ্রাম এখনও অনেক দূরে। রাতে পথ চলা যাবে না, ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। সাপ বিচ্ছুর ভয় আছে। সিদ্ধান্ত হল-একটা বড়োসড়ো গাছের নিচে রাত যাপন করা হবে।

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। তিন বন্ধুর খাবারের জন্য চাল সাথেই ছিল। পাতিলও ছিল। কিন্তু জ্বালানি ছাড়া রান্নার তো ঝক্কি-ঝামেলা অনেক। তাদের কাজের কথা ভাবতেই গায়ে জ্বর এসে যায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল রান্না হবে খুবই সংক্ষিপ্ত । খিঁচুড়ি।

আয়োজন শুরু হল। চাল, ডাল, লবণ সাথেই ছিল। কিন্তু জ্বালানি ছাড়া রান্না হবে কেমন করে? লাকড়ি যোগাড় করার দায়িত্ব নিতে কেউই রাজি নয়। তিনজনেই পড়ল মহাবিপদে। সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত তারা পৌঁছল একটা অদ্ভুত মীমাংসায়। যার মুখ থেকে প্রথমে কথা বেরুবে, তার কাঁধেই পড়বে লাকড়ি যোগাড়ের ভার। সিদ্ধান্ত মতো সবাই চুপ, কারো মুখে কোনো কথা নেই। এদিকে প্রচণ্ড খিদে

পেটের নাড়িভূড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। প্রচণ্ড খিদে নিয়েই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল তিন অলস।

এদিকে শেষ রাতে জঙ্গলের পাশের গ্রামে বড় ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে গেল। সিঁদ কেটে মালপত্র নিয়ে যাওয়ায় গ্রামের সকলেই চোর ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ল। গ্রামের মোড়ল সিপাই পাঠিয়ে জঙ্গল ঘিরে ফেলল। একটি দল এসে হাজির হলো সেই গাছের তলায়। তাদের দেখে সিপাইরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। লাথি-গুতা খেয়ে ঘুম ভাঙল তাদের। একি আপদ, বলা নেই কওয়া নেই মারপিট করছে। এসব কথা তিন কুড়ে মনে মনে ভাবল আর তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। চড়-থাপ্পড়, লাথি চলছে, তবু চুপ মেরে আছে তারা। যেন কেউ তাদের মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা যাচ্ছো কোথায়? কারো উত্তর নেই। জঙ্গলের মধ্যে ঘুমাচ্ছ কেন হতভাগার দল? কোনো উত্তর নেই। সিপাইরা ভাবল–নিজেদের অপরাধ ঢাকার জন্য এরা বোবা সেজেছে। গণপিটুনি দিলেই মুখ খুলবে। মারের উপর ঔষধ নেই।

সিপাইদের প্রধান হুকুম দিলেন–সামনের চোরকে দশ ঘা চাবুক মারো। আচ্ছা পিটুনি না দিলে ওদের পেট থেকে কথা বেরুবে না। দশ ঘা চাবুক মারা হল। তবু টু শব্দটি পর্যন্ত করলো না। এবার দ্বিতীয় জনের পালা। তাকেও মারা হল বিশ ঘা চাবুক। তীব্র যন্ত্রণার মাঝেও আহ্ শব্দটি বেরুল না তার মুখ থেকে।

এরপর তৃতীয় জনের পালা। তাকে পঞ্চাশ ঘা চাবুক মারা হলো। নিরবে সব যন্ত্রণা সহ্য করলো সে। শেষ দিকে চাবুকের ঘা সহ্য করতে না পেরে আহ্ শব্দটি উচ্চারণের পরপরই দুই বন্ধু কথা বলে উঠলো–এবার তোমাকেই লাকড়ি যোগাড় করে আনতে হবে। সিপাইরা তাদের এসব কাণ্ড দেখে থ বনে গেল।

শিক্ষা : *অলসতা বড় দোষ যার ঘাড়ে চাপে*
সাধের জীবন তার যায় পরিতাপে।

নাতি ও জ্বীন

এক মুরব্বী জ্বীনের আমল করছিলেন। তার কাছে বেশ কয়েকটি জ্বীন ছিল। কোনো মানুষকে জ্বীন আছর করলে তিনি ঝাড়-ফুঁক দিয়ে ছাড়ান। মাঝে মধ্যে তেল পানি পড়িয়ে দেন। এতে মানুষ তাকে টাকা দেয়। এভাবে তার বেশ ভাল টাকা উপার্জন হয়।

তার একটা নাতি ছিল। সে ছিল খুব দুষ্ট। একদিন সে বলল–দাদা! তুমি তো জ্বীনের আমল করে বসে বসে ভাল ব্যবসা শুরু করেছো। কী একটু ঝাড়-ফুঁক দাও আর তেলপানি পড়িয়ে দাও, তাতে মানুষ তোমাকে টাকা দেয়। দাদা হাসতে হাসতে বললেন–এটা তুমি বুঝবে না। নাতি বলল, দাদা! আমিও জ্বীনের আমল করে তোমার মতো টাকা কামাই করব। আমাকে আমল করতে শিখিয়ে দাও। দাদা বললেন–তুমি পারবে না। সে বলল–না, আমি পারব। দাদা আবার বললেন–তুমি পারবে না। নাতি বলল–পারব।

অবশেষ দাদা বললেন–ঠিক আছে, তুমি প্রতিদিন গভীর রাতে একা সূরাহ জ্বীন পড়বে। এভাবে এক চল্লিশ দিন আমল করবে। শেষের দিন জ্বীন তোমার সামনে বাঘ হয়ে আসবে। তুমি ভয় করবে না। বাঘ তোমার সামনে আসলেই তুমি ওর ঘাড় ধরে ফেলবে। ঘাড় ধরলেই সে জ্বীন হয়ে যাবে।

সে আমল শুরু করে দিল। শেষের দিন ঠিকই তার সামনে বাঘ এলো। সে সাহস করে এক লাফে বাঘের ঘাড় ধরে ফেলল। অমনি বাঘ জ্বীন হয়ে তাকে বলল–'কাম দে, না হয় জান দে।' সে এখন পড়ল বিপদে। কী করবে? পাশেই একটা বড় জঙ্গল ছিল। সে বলল, ঐ জঙ্গলটা কেটে পরিষ্কার করে দাও। জ্বীন মুহূর্তের মধ্যেই জঙ্গল পরিষ্কার করে এসে আবার বলল, 'কাম দে, না হয় জান দে।' সে ভয় পেয়ে গেল। তবুও মনে সাহস এনে বলল, ঐদিকে যে নদীটা আছে, তার পানিটা শুকিয়ে দাও। যেন বোঝা না যায় যে, ওখানে পানি ছিল। নদী শুকিয়ে কিছুক্ষণ পর জ্বীন এসে বলল, 'কাম দে, না হয় জান দে।'

এবার ছেলেটার ভয়ে কলিজা শুকিয়ে গেল। কোনো কুল-কিনারা পাচ্ছে না কী করবে? হঠাৎ বুদ্ধি করে বলল, ঐ যে কুকুরটা শুয়ে আছে, তার লেজটা সোজা করো। জ্বীন বলল, এটা সহজ কাজ। জ্বীন ঘি আর তৈল দিয়ে কুকুরের লেজ সোজা করতে শুরু করল। কিন্তু লেজ সোজা হয় না। জ্বীন এবার লেজটি ঘি দিয়ে মালিশ করে লোহার চুঙ্গির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে টান টান করে বেঁধে রাখল। কিছুক্ষণ পরে মনে করল–এবার হয়ত সোজা হয়েছে। কিন্তু যখনই লেজ খুলে দিল, দেখল–আবার আগের মতোই বাঁকা। এবার জ্বীনই পড়ল মহাবিপদে।

ছেলেটা এই কাণ্ড দেখে বলল, লেজ সোজা করতে না পারলে তোর রক্ষা নেই। জ্বীন শুনে ভয় পেয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও লেজ সোজা করতে না পেরে বেচারা জ্বীন ক্ষমা চেয়ে জান নিয়ে পালিয়ে গেল। ছেলেটিও জ্বীনের হাত থেকে প্রাণে বাঁচল।

শিক্ষা : *যে কোনো কাজ সবার পক্ষে করা সম্ভব নয়।*

স্বার্থপরের পরিণাম

কবিরের বাড়ির পাশেই ছিল এক দরবেশ। দরবেশ ছিল খুবই আল্লাহভক্ত। তিনি সব পশু-পাখির ভাষা বুঝতেন। কবির এ খবর শুনে পশু-পাখির ভাষা বোঝার আগ্রহ প্রকাশ করলো। কারণ, তার বাড়িতে ছিল একটি পোষা কুকুর ও একটি বিড়াল। তাদের ভাষা বোঝার জন্যেই তার আগ্রহ প্রকাশ। একদিন কবির ঐ দরবেশের নিকট গিয়ে দোয়া চাইল। দরবেশ দোয়া করার পর থেকে সে পশু-পাখির ভাষা বুঝতে পারতো। দরবেশের দরবার থেকে খুশি হয়ে সে বাড়ি ফিরল। তার কুকুর ও বিড়াল সব সময় বারান্দায় ঘুমায়।

গভীর রাত। কবির ঘুমে অচেতন। কিন্তু কুকুর ও বিড়াল ঘুমায়নি। তারা দু'জনে কথোপকথন করছে। কুকুর ও বিড়ালের কথা শুনে কবির

জেগে গেল। কুকুর বলছে–দোস্ত! আমাদের মালিকের গরুটা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যাবে।

একথা শুনে কবির মনে মনে কুকুরকে ধন্যবাদ দিল। সে তাকে একটি বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। পরের দিন কবির গরুটা বিক্রি করে দিল। যে ব্যক্তি গরুটি কিনল তার বাড়িতে গিয়ে গরুটি মারা গেল। দ্বিতীয় দিন কবির যখন শুয়ে আছে, তখন বিড়ালটি কুকুরকে বলছে– দোস্ত! আগামীকাল আমাদের মালিকের যে চাকর ছেলেটা আছে তার খুব অসুখ হবে। সাথে সাথে চিকিৎসা না করলে সে মারা যাবে।

একথা শুনে আজও সে বিড়ালকে ধন্যবাদ দিল। পরের দিন সকালে চাকরকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। সে বাড়িতে গিয়ে অসুখে ভুগলো। কবির নিজ বাড়িতে রেখে তার চিকিৎসা করলো না।

এর কয়েক দিন পর কবির শুনতে পেল–কুকুর বিড়ালকে বলছে, আগামী তিন দিনের মধ্যে আমাদের মনিব মারা যাবে। একথা শুনে কবির হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। সকালে তাড়াতাড়ি দরবেশের কাছে এলো বাঁচার কোনো উপায় বের করা যায় কিনা তা জানার জন্য। কবির কাঁদতে কাঁদতে দরবেশকে বললো, আমি আর পশু-পাখির ভাষা বুঝতে চাই না। আমি যাতে এ ভাষা আর না বুঝি, সে ব্যবস্থা করুন। দয়া করে আমাকে বাঁচান।

একথা শুনে দরবেশ বললেন, যে ব্যক্তি স্বার্থের জন্য অন্যের ক্ষতি করে, তার কোন্ ক্ষমা নেই। তোমার মৃত্যু হওয়াই উচিত।

শিক্ষা : *স্বার্থপরতার একটা কুফল তো অবশ্যই আছে।*

কলমের জোরই বেশি

বাদশাহ শাহজাহান ছিলেন দিল্লীর সম্রাট। সম্রাটের একটি দপ্তর ছিল, সেখানে সৈনিকদের মাসিক ভাতা দেওয়া হতো। যিনি ভাতা দিতেন, তাকে বলা হতো মুন্সীজী। মুন্সীজী একদিন দপ্তরের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমন

সময় ঝড়ের বেগে হাজির হলো একজন সৈনিক। যে কোনো কারণে ভাতা নিতে তার দেরি হয়ে গিয়েছিল। সৈনিকটি ভেতরে ঢুকেই বজ্রকণ্ঠে বললো–আমার মাইনেটা দিয়ে দাওতো।

মুন্সীজী শান্ত গলায় বললেন–আমার হাতের কাজটা সেরেই তোমার মাইনেটা দিচ্ছি। সৈনিক রেগে গিয়ে বললো–জলদি করো। আমার আবার তাড়া আছে, বসার একদম সময় নেই। মুন্সীজী তখন হিসাব মেলাচ্ছিলেন, অন্য কাজে মন দেবার একদম সুযোগ নেই। তাই বললেন, বাপু! তোমাকে বসতেই হবে। হাতের কাজ শেষ না করে তোমাকে ভাতা দিতে পারছি না। সৈনিক এবার কড়া মেজাজে বললো–কি! আমার মাইনে দিয়ে দাও, তা না হলে তোমার সামনের দাঁত দু'টি তুলে ফেলবো।

মুন্সীজী কলম উচিয়ে বললেন–আমার দাঁত তুলে ফেলবে? আমার হাতেও কলম আছে। ভেবো না আমি দুর্বল। আমিও কলম দিয়ে কিছু করতে পারি। মুন্সীজীর কথায় কান না দিয়ে সে বললো–কলম দিয়ে করবে কচু। এখন দিয়ে দাও আমার মাইনেটা। মুন্সীজী আর কথা না বাড়িয়ে সৈনিকের ভাতা দিয়ে দিলেন। সৈনিক চলে যেতে যেতে বললো–আমাকে ভয় দেখিও না বাপু। তোমার কলমের চেয়ে আমার তলোয়ার অনেক বড়। সৈনিকের কথায় মুন্সীজী মনে ভারি ব্যথা পেলেন। মনে মনে বুদ্ধি আঁটলেন, কেমন করে সৈনিককে জব্দ করা যায়। সহসা একটা বিষয় তার মাথায় এলো। তখনকার দিনে সৈনিকদের বেতন নিতে হলে শরীরের একটি চিহ্ন দেখাতে হতো। আগেই চিহ্নটির কথা বেতনের খাতায় লেখা থাকতো। মুন্সীজী বুদ্ধি করে বেতনের খাতায় শরীরের চিহ্নের ঘরে লিখলেন–'সৈনিকটির সামনের দুটো দাঁত নেই।'

মাসখানেক পরের কথা। মুন্সীজী বেতনের টেবিল থেকে সরে গিয়ে অন্য জায়গায় বসলেন। আর বেতনের টেবিলে অন্য একজন লোক বসলো। সেই সৈনিকটি আসলো মাইনে নিতে। নতুন লোকটি খাতা খুলে সৈনিককে জিজ্ঞাসা করলো–আপনার পিতার নাম? সৈনিক তার পিতার নাম বললো। কর্মচারী বলল–দেখি, আপনার দাঁত দেখান তো।

সৈনিক–কেন?

কর্মচারী–খাতায় লেখা আছে, আপনার সামনের দু'টি দাঁত নেই।

সৈনিক–নাতো! আমার চিহ্নতো কাটা আঙ্গুলটা।

কর্মচারী–না, খাতায় যা লেখা আছে, তা-ই মানতে হবে। তা না হলে বেতন পাবেন না।

সৈনিকটি আর রাগও করতে পারল না, বেতন না নিলেও চলে না। তাই বাধ্য হয়ে হেকিমের কাছে গিয়ে তার সামনের দাঁত দুটো তুলে ফেললো। সৈনিকটি রক্তমাখা মুখে হাজির হলো দপ্তরে। বেতন নিয়ে যাওয়ার পথে দেখতে পেল আগের মুন্সীজীকে, যে তারই দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। সৈনিকটি মুন্সীজীকে বললো–সত্যিই কলমের জোরই বেশি। আমার উচিত শিক্ষা হয়েছে। আমি আর কোনোদিন তলোয়ারের বাহাদুরী দেখাবো না।

শিক্ষা : *অসি কি আর মসির সাথে পারে?*

দূর হলো কৃপণতা

এক কৃপণ প্রতিজ্ঞা করল বিয়ে করবে না। বন্ধুরা তাকে অনেক বুঝাল। নানাভাবে বিয়ের প্রলোভন দিল, প্ররোচিত করল। কিন্তু অর্জিত সম্পদ খরচ হয়ে যাবার ভয়ে কৃপণ বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু বন্ধুদের অনেক পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত সে রাজি হলো একটি শর্তে, তা হচ্ছে–আমি দৈনন্দিন যে আহার করি, বউ যদি অনুরূপ আহারে সন্তুষ্ট থাকে, তবে বিয়ে করব। বন্ধুরা তাদের পরিচিত এক মেয়ের ভাইকে কৃপণের অঢেল ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট করে বোনকে তার সাথে বিয়ে দিতে রাজি করালো।

যথারীতি শুভ কাজ সম্পন্ন হল। শুরু হলো কৃপণের সংসারজীবন। স্বামী প্রবর কৃপণ নিরামিষ ছাড়া অন্য কিছু খেতো না। তার স্ত্রী তো আর এ রকম লাগাতার বিরামিষ ভোজনে অভ্যস্ত নয়। তাই কিছুদিন যেতে না যেতেই খাবারের প্রতি সে তার রুচি হারাতে বসল। ফলে কৃপণের স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। বোনের মারাত্মক অসুখে ভাইদের দুঃচিন্তার অন্ত নেই। মালের লোভে বোনকে তার কাছে বিয়ে দিয়েছিল। এখন দেখি হিতে

বিপরীত। সম্পদ তো দূরের কথা, বোনেরই মরণ দশা। কৃপণের আহারনীতি কিভাবে পরিবর্তন করা যায়–এই ভেবে ভাইয়েরা ব্যাকুল।

একদিন এক ভাই একটি কৌশলের কথা অন্য ভাইদের জানাল। অন্য ভাইয়েরা তার কৌশল প্রয়োগে সম্মতি দিল। শুরু হল কৃপণের চিকিৎসা। ভাইয়েরা বোনের সহযোগিতায় কৃপণকে ঔষধ খাইয়ে বেহুশ করল। অবচেতন অবস্থায় তার গায়ে কাফনের কাপড় পরাল এবং একটি জনশূন্য ঘরে শুইয়ে দিল। তার চারপাশে পর্দা টেনে দুই ভাই পর্দার আড়ালে বসল। এক ভাই পর্দার আড়ালে থেকে অপর ভাইকে জিজ্ঞেস করল–তোমার রব কে? তোমার ধর্ম কী? তুমি দুনিয়াতে কী কাজ করেছো? অমুক বস্তু কি খেয়েছ? কেন খাওনি?

অর্ধ অচেতন কৃপণ এদের কথোপকথন শুনে উদ্বিগ্ন হলো। হায় আমাকেও বুঝি এখন জিজ্ঞেস করবে। একটু পরে সাদা কাপড়ে আবৃত এক ব্যক্তি কৃপণের কাছে এসে পূর্বেকার মতো তাকেও জিজ্ঞেস শুরু করল। মুনকার-নকীরের মতো প্রশ্নকারী যখন জিজ্ঞেস করল, এতো ধন-সম্পদ ও অঢেল নিয়ামত থাকতে তুমি শুধু নিরামিষ খেয়ে জীবন কাটালে কেন? প্রশ্নকারীকে সে কোনো জবাব দিতে পারলো না। ফলে প্রশ্নকারী অপরজনকে চাবুক নিয়ে আসতে নির্দেশ দিল। চাবুক দিয়ে কৃপণকে খুব প্রহার করল। তারপর তাকে ওষুধ খাইয়ে বাড়িতে নিয়ে এলো। কাফনের কাপড় খুলে নিত্য ব্যবহার্য কাপড় পরিয়ে দিল।

নেশার ঘোর কেটে গেলে কৃপণ স্ত্রীকে ডেকে বাজারের ব্যাগ দিতে বলল। বাজারে গিয়ে সে মজার মজার রকমারী খাবার কিনে আনল। বাজারের দোকানীরা তো কৃপণের বাজার দেখে হতবাক। তাকে তারা কোনো দিন এভাবে বাজার-সওদা করতে দেখেনি।

শিক্ষা : *কৃপণতা করা ভাল নয়, কৃপণের ধন মাটিতে খায়।*

হায়রে বোকার দল

এক গ্রামে বাস করত ছয় বোকা। তাদের মধ্যে ছিল ভীষণ ভাব। একদিন তারা ঠিক করল–দূর গ্রামে কাজ করতে যাবে। ভোর হওয়ার পূর্বেই পৌঁছা দরকার। তাই তারা সাঁঝ-সন্ধ্যায় যাত্রা আরম্ভ করল। সারা পথ হেঁটে যেতে হবে। পথে একটি নদী থাকলেও সেখানে নৌকা পাওয়া যায়। তারা দ্রুত হাঁটতে লাগল। চাঁদের আলোতে তাদের পথ চলতে খারাপ লাগছে না। ইতোমধ্যে তারা নদীর পাড়ে এসে পৌঁছল। গ্রীষ্মকালে নদীর পানি শুকিয়ে একাকার। নদীতে বালি আর বালি। চাঁদের আলোতে বালিগুলো পানির ঢেউয়ের মতো দেখাচ্ছে। নদীর প্রস্থ পৌনে এক মাইল। এক বোকা বলে উঠল–গত বছর এ পথে যাওয়ার সময় নৌকা ছিল, অথচ এখন নৌকা দেখছি না। অন্য একজন বলল, এত রাতে কি নৌকা থাকে? তাই কোনো উপায় না দেখে তারা সিদ্ধান্ত নিল–সাঁতার কেটে নদী পাড়ি দেবে।

কাপড় চোপড় বেঁধে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। ঝাঁপিয়ে পড়েই দুই তিন জন একসাথে বলে উঠল–আজ নদীতে পানি এত শক্ত কেন? হাত-পায়ের হাঁড়গোড় ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। তাদের একজন শাসিয়ে দিয়ে বলল–সাঁতার কাট, কোন কথা নেই। সবাই হামাগুড়ি দিয়ে সাঁতার কাটছে। হাত-পায়ের চামড়া উঠে যাচ্ছে সবার। অনেক কষ্টে তারা বালির উপর হামাগুড়ি দিতে দিতে অপর প্রান্তে পৌঁছল। তীরে উঠে সবাই একসাথে বলে উঠল– 'এমন শক্ত পানি জীবনেও দেখিনি।' নদীর পাড়ে উঠে একজন বলল : ছেন্টু! গুণে দেখতো, সবাই আছি কিনা? ছেন্টু এক দুই করে গুণে পেল পাঁচজন। আমাদের আরেকজন গেল কোথায়? একথা বলে ছেন্টু চিৎকার করে উঠল। এভাবে সবাই একে একে গুণে পেল পাঁচজন।

সবাই ভাবল–তাদের একজন পানিতে ডুবে মরেছে। সবাই চিন্তায় পড়ে গেল। কেউ আর অশ্রু ধরে রাখতে পারল না। এত দিনের সাথীকে কি সহজে ভোলা যায়? ভাবতে ভাবতে তাদের অজান্তেই ভোর হয়ে গেল। এমন সময় একজন লোক এসে বলল–আপনারা এখানে কী করছেন? এভাবেই দুই তিন

বার প্রশ্ন করার পর এক বোকা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলল–'রাতে নদী পার হওয়ার সময় আমরা আমাদের এক সাথীকে হারিয়ে ফেলেছি, তাই এত চিন্তা'। লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল–কোন নদীতে ডুবেছে? বোকারা বলল–এই যে এই নদীতে। লোকটি তৎক্ষণাৎ বলল–এই নদীতে তো পানি নেই, ডুববে কী করে? তখন অন্য বোকারা রাগত স্বরে বলল–আপনার কাজে আপনি যান। যদি নদীতে পানি না থাকে, তাহলে আমাদের একজন গেল কোথায়?

লোকটি তখন বলল–আপনারা কয়জন ছিলেন? তখন সবাই একসাথে বলল–'ছয়জন'। গাঁয়ের লোকটি তাদের গুণে ছয়জন পূর্ণ করে দিল। ছয় বোকা লজ্জিত হয়ে আবার যাত্রা শুরু করল। আসলে তারা প্রত্যেকেই নিজেকে বাদ দিয়ে গুণেছিল। তাই একজন কম হচ্ছিল।

শিক্ষা : *বোকামীর কারণে অনেক ক্ষেত্রে ধরা খেতে হয়।*

কুমির ও শিয়াল

এক দেশে ছিল এক কুমির। তার ছিল তিন বাচ্চা। বাচ্চাদের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করে কুমির খুব টেনশন ফিল করছিল। একদিন সে জানতে পারলো–শিয়াল পণ্ডিত চশমা চোখে দিয়ে লাঠি হাতে নিয়ে খুব ভাল পড়ায়। তাই সে তৎক্ষণাৎ বাচ্চাদের নিয়ে গেল শিয়ালের কাছে। আর বলল, বাচ্চাদের একটু ভালমত পড়াইও, মাস শেষে ভাল মাইনে পাবা। শিয়াল খুশি মনে রাজি হয়ে গেল।

এদিকে শিয়াল বাচ্চাদের পড়াল–তিন থেকে এক বাদ দিলে কত থাকে? বাচ্চারা বলল–আমরা তো জানি না। শিয়াল তখন একটা বাচ্চাকে আড়ালে নিয়ে খেয়ে এসে বলল, এবার কত থাকে? বাচ্চারা বলল–দুইটা। সাবাস! ঠিক বুঝতে পেরেছ। এইতো শিক্ষা হল। পরের দিন আবার সেই আগের মতো প্রশ্ন, দুই থেকে এক গেলে কত থাকে? বাচ্চারা আগের মতো বললো–জানি না। এবারও শিয়াল আড়ালে নিয়ে আরেকটা খেয়ে ফেলল এবং আগের মতো সাবাস দিল। এর পরদিন কুমির এলো বাচ্চাদের

দেখতে। শিয়ালকে বলল–বাচ্চাদের কী খবর? শিয়াল বলল–খুব ভাল। তোমার বাচ্চাদের বিয়োগ অংক শিখিয়েছি। শুনে কুমির খুব আনন্দিত হয়ে বাচ্চাদের দেখতে চাইলো। শিয়াল চালাকি করে এক বাচ্চাকেই একের পর এক ঘুরিয়ে এনে তিনবার দেখালো। কুমির খুশি মনে বাড়ি ফিরে গেল। আর শিয়ালকে বললো–অমুক তারিখে এসে বাচ্চাদের নিয়ে যাবো। পরের দিন শিয়াল শেষ বাচ্চাটাও খেয়ে শিয়ালিণীকে বললো–চলো এবার আমরা পালাই।

নির্দিষ্ট দিন কুমির এসে শিয়ালকে ডাকল, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। তখন সে গুহার ভেতরে গিয়ে দেখল–সেখানে কুমিরের বাচ্চাদের হাঁড় ছাড়া কিছুই নেই। সে রেগেমেগে বলল–দাঁড়া শিয়াল, তোকে পেয়ে নিই। এদিকে শিয়াল দেখল–কুমিরের কোনো খবর নেই। তাই সে শিয়ালিণীকে বলল–চল, খালের ওপার থেকে খাবার নিয়ে আসি।

সেই খালে ছিল কুমির। ওরা যখন খাল পার হচ্ছে, কুমির দেখল–এইতো সুযোগ যায়। শিয়ালিণী পার হয়ে গেল। শিয়াল যখন পার হতে লাগল, কুমির সেই সুযোগে শিয়ালের পায়ে দিল কামড়। শিয়াল দেখলো–এখন তো মহাবিপদ। তৎক্ষণাৎ শিয়ালের মাথায় বুদ্ধি এলো। সে শিয়ালিণীকে বলল–ওগো! কে যেন আমার লাঠিতে ধরেছে। কুমির ভাবলো, মনে হয় সে সত্যিই লাঠি ধরেছে। তাই সে শিয়ালের পা ছেড়ে দিল। সে বারের মত শিয়াল রেহাই পেল। কুমির নতুন ফন্দি আঁটতে লাগলো। কি করে শিয়ালকে ঘায়েল করা যায়।

একদিন কুমির ধু-ধু বালুর মাঠে মরার ভান করে শুয়ে রইলো। দেখে বোঝার উপায় নেই যে, কুমির মৃত না জীবিত ! কুমির ভাবলো–শিয়াল আমাকে মরা ভেবে খেতে আসবে, আর এই সুযোগে আমিও শিয়ালকে দেখে নেব।

এদিকে দু'দিনের ক্ষুধার্ত শিয়াল সেই পথ দিয়ে খাবারের সন্ধানে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে মরা কুমির দেখে বলল–এইতো খাবারের সন্ধান পাওয়া গেল। এবার মজা করে খাওয়া যাবে। কিন্তু কুমির সত্যিই মরা কি না সে ব্যাপারে তার সন্দেহ হলো। একটু পরীক্ষা করে দেখবে ভাবল। সে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে কুমিরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো, ছি! ছি! এমন চার পাঁচ দিনের পঁচা মরা গন্ধওয়ালা কী করে খাওয়া যায়? একটু তাজাতুজা

হলে আজকের ভোজনটা বেশ মজার হতো। এখন যেহেতু মরা, থাক এবার চলে যাই। কুমির ভাবলো–আমি আমার লেজটা একটু নাড়াবো, আমাকে তাজা ভেবে শিয়াল খেতে আসতে পারে। যেই ভাবা সেই কাজ, কুমির তার লেজটা একটু নাড়া দিল। শিয়াল তা দেখে বলল–ও, তুমি আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য মরার ভান করেছ? এই বলে শিয়াল সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে বাঁচল। এদিকে বোকা কুমির মাথা চাপড়িয়ে নিজের বোকামীর জন্য বাচ্চাদের শোকে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাল।

শিক্ষা : *দেখলে তো–বোকা হলে কোন কাজ পরিকল্পনা মাফিক সমাধা করা যায় না। তাই আমরা সকল কাজ সুস্থ বিবেক দিয়ে চিন্তা করেই তারপর করব।*

মূর্খ আবিদের কাণ্ড

এক মহল্লায় এক মূর্খ আবিদ ছিল। সে খুব ইবাদত-বন্দেগী করতো। মানুষ তাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো এবং তাকে বুযুর্গ বলে ভাবতো। ঐ মহল্লায় একজন চালাক ব্যক্তি ছিল, সে ঐ আবিদ সাহেবের বুযুর্গীর পরীক্ষা করার ইচ্ছা করল।

একদিন ঐ আবিদ যখন তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠলো, তখন চালাক লোকটি তার ছাদে উঠে আস্তে আস্তে আবিদকে ডাকল। আবিদ বলল–কে? সে উত্তর দিল–আমি জিবরাইল ফেরেশতা! আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, তুমি অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছ, এখন শীতও খুব তীব্র, রাতে উঠে অজু করতে তোমার খুব কষ্ট হয়, খোদার এতে লজ্জা হয় যে, তোমার মতো এক বৃদ্ধ বান্দাকে এরূপ কষ্ট দেন। সুতরাং এখন থেকে তোমার নামায মাফ করে দেওয়া হল।

এ কথা শুনে সেই মূর্খ মহাখুশি। বিছানায় শুয়ে পা ছড়িয়ে নাক ডেকে ঘুমিয়ে রইল। এমনকি ফজরের নামাযেও শরীক হলো না। লোকজন মনে

করল–হয়তো তার শরীর খারাপ। কিন্তু সে যখন কয়েক ওয়াক্ত নামাযে অনুপস্থিত, তখন মহল্লাবাসী তার অবস্থা জানার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে দেখে–সে সম্পূর্ণ সুস্থ। খাটে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, মিয়া সাহেব! শরীর কেমন আছে? সে বলল, খুব ভাল আছি। লোকেরা আবার প্রশ্ন করল, নামাযে আসেন না কেন? তখন সে গর্বের সাথে বলল, ভাইসব! জীবনে বহু নামায পড়েছি, ইবাদত-বন্দেগী করেছি। তাতে খোদা আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে আমার নামায মাফ করে দিয়েছেন। লোকেরা বলল–সেটা কিভাবে বুঝলেন? সে উত্তর দিল–আমার নিকট জিবরাইল ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনিই এ কথা বলে গিয়েছেন। তখন চালাক লোকটি বলল–আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতে সর্বোচ্চ মকামে ছিলেন, তথাপিও তাঁর নামায মাফের কোনো ওহী আসেনি, তাহলে কি আপনি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বড় হয়ে গেলেন?

মূর্খ লোকটি এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেল। বিষয়টি তাকে ভাবনায় ফেলে দিল। তখন উপস্থিত লোকজন বলল–নিশ্চয় তোমার নিকট ফেরেশতা নয়, শয়তান এসেছিল এবং সে তোমায় গোমরাহ্ করে গেছে। তখন চালাক লোকটি আসল ঘটনা ফাঁস করে বলল–তোমার বুযুর্গী পরীক্ষা করার জন্য আমিই এমনটি করেছিলাম। মূর্খ বুযুর্গ তখন তাওবা করল এবং বুঝতে পারল–ইলম না শিখলে এভাবে পদে পদে ধোকা খেতে হয়। তাই সে এখন থেকে ইলমে দীন শিক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করল।

শিক্ষা : *রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–ইলমহীন আবিদের চেয়ে একজন আলেমের মরতবা তত বড়, তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মরতবা যত বড়।*

জমে আমারে নিল না

এক ছিল স্ত্রী। সে স্বামীর কথা শুনতে চাইত না এবং ঠিক মতো কাজ করত না। কাজ করলে শুধু বকবক করত, আর বলত–জমে আমারে নিল না। আমার এত কষ্ট! স্বামী তার কাজ-কারবারে অসন্তুষ্ট ছিল।

এক রাতে স্ত্রী যখন কাজ করতে গিয়ে বলল যে, আহারে কষ্ট! জমে আমারে নিল না; জমে কি আমারে দেখে না? আসলে স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতাই তার এরূপ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ছিল। স্বামী তখন মনে মনে ভাবলো–তোমাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে সোজা করতে হবে। স্বামী একখানা ফন্দি বের করলো এবং রাতের খাওয়া শেষে ঘরের পেছনে একটি গাছে উঠে বসে রইলো।

রাত ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্ত্রী যখন খাওয়া শেষে উচ্ছিষ্ট পানি বাইরে ফেলতে গেল এবং অভ্যাসগতভাবে বলতে লাগলো–আহারে! আল্লাহ আমার জম কোথায় রেখেছ? জমে কি আমারে দেখে না? জমে আমারে নিল না! এমন সময় স্বামী ঘরের পেছনের গাছ থেকে চিৎকার মেরে বলে উঠলো–নি-ম নি-ম। শুক্কুর বারে নি-ম।

স্ত্রীর অবস্থা তখন করুণ। মুখ থেকে ভয়ে বের হল–আল্লাহ! আমারে নিও না, আমি আর এরূপ বলুম না! চেহারা ফ্যাকাশে অবস্থায় সে দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। তার পর থেকে সে ভাল হয়ে গেল। পুরোপুরিভাবে স্বামীর আনুগত্য করল। এখন আর বকবক করে না। ধৈর্যের সাথে সব কাজ সমাধা করে।

শিক্ষা : *এ ধরনের স্ত্রীদেরকে এভাবেই শিক্ষা দিতে হয়।*

শক্তির চেয়ে বুদ্ধিই বড়

বন পেরিয়ে চাষী যাচ্ছিল জমি চাষ করতে। চাষী বনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ কিসের যেন শব্দ শুনল। একটু এগিয়ে যেতেই দেখলো, এক বিশাল ভাল্লুক একটি ছোট্ট খরগোশের সাথে ভয়ানক লড়াই করছে। ভাল্লুক যেই খরগোশকে ধরতে যায়, অমনি খরগোশ তার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে লাফ মেরে সরে যায়। কিছুতেই খরগোশকে সে ধরতে পারছে না। ভাল্লুকের এই অবস্থা দেখে চাষী হো হো করে হেসে উঠল।

চাষীর হাসি শুনে ভাল্লুক রেগে গেল। সে চাষীকে বললো–দাঁড়াও, আমি তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। এই বলে ভাল্লুক চাষীকে ধরে ফেললো। চাষী কাঁপতে কাঁপতে বললো, আমাকে এবারের মতো মাফ করে দাও। আমি আর কখনও হাসবো না। ভাল্লুক বললো–আমি অনেক দিন ধরে মানুষের গোশত খাই না। আমি তোমাকে খাব এবং তোমার বলদ দুটোকেও খাব।

চাষী বললো–বেশ, আমাকে আর আমার বলদ দুটোকেও খাও আপত্তি নেই। কিন্তু আজ বিকেল পর্যন্ত আমাদের বাঁচতে দাও। আমি এর মধ্যে আমার জমিটা চাষ করে ফসল লাগাই, যাতে আমার ছেলে-মেয়েরা দু'বেলা খেতে পায়। ভাল্লুক বললো–ঠিক আছে, এখনকার মত ছেড়ে দিলাম। বিকেলে আমি তোমাকে আর তোমার বলদ দুটোকে চাই। চাষী জমিতে গিয়ে চাষ করতে লাগলো। তার মুখে হাসি নেই, কণ্ঠে সুর নেই। গভীর চিন্তার ছাপ চোখে-মুখে।

সেই বনে বাস করতো এক শিয়াল। শিয়াল দেখলো চাষীর মুখে হাসি নেই, কণ্ঠে সুর নেই। গভীর চিন্তায় চাষী নিমগ্ন। শিয়াল বললো, কি চাষী ভাই। তোমার কী হয়েছে? তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন? কী ভাবছো? চাষী বললো, তোমাকে বলে কোনো লাভ হবে না। আমার অনেক দুঃখ। আজ বিকেল পর্যন্তই আমার আয়ু আছে। আজ বিকেলে ভাল্লুক আমাকে আর বলদ দুটোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে। শিয়াল বললো, তুমি যদি আমার কথা মতো কাজ কর, তাহলে তোমার প্রাণও যাবে না, তোমার বলদ দুটোও প্রাণে বেঁচে যাবে। চাষী বললো, তা কী করে সম্ভব? শিয়াল বললো,

বুদ্ধি থাকলে সবই হয়। জেনে রেখো–শক্তির চেয়ে বুদ্ধিই বড়। এই বলে সে চাষীকে কানে কানে একটা বুদ্ধি দিল। শিয়ালের বুদ্ধিতে চাষী খুব খুশি হলো। শিয়াল বললো–আচ্ছা, আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করবো। তার বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে? চাষী বললো, তুমি যা চাও, তাই দেবো। শিয়াল বললো, আমাকে তুমি দুইটা বড় মোরগ ও আটটি মুরগী দেবে। চাষী সানন্দে রাজি হলো।

বিকেলে চাষীর সঙ্গে শিয়ালও চললো। শিয়াল একটু দূরে এক ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। ভাল্লুক যেই চাষীকে ধরলো, অমনি ঝোঁপের ভেতর থেকে শিয়াল 'কোয়াক' করে শব্দ করল। এই অদ্ভুত শব্দ শুনে ভাল্লুক চাষীকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কিসের শব্দ? চাষী বললো, পথে একদল শিকারীকে দেখলাম। ওটা বোধ হয় সেই শিকারীদের শব্দ। শিকারীর কথা শুনে ভাল্লুক ভয় পেয়ে গেল। সে চাষীকে বললো, ভাই! তুমি আমাকে বাঁচাও। শিয়ালের কথা মতো চাষী আগেই বড় একটা বস্তা এনেছিল। সে ভাল্লুককে বলল, তুমি এর ভেতর ঢুকে পড়। আমি মুখ বন্ধ করে দেবো। শিকারীরা ভাববে–এটা চালের বস্তা।

ভাল্লুক চাষীর কথামত বস্তায় ঢুকে পড়লো। চাষী সঙ্গে সঙ্গে বস্তার মুখ বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ পর শিয়াল ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এসে মোটা গলায় বললো, বস্তার ভেতরে কী? চাষী বললো, চাল। শেয়াল বললো–আমি বিশ্বাস করি না। তুমি কুড়াল দিয়ে এর মধ্যে আঘাত কর। তাহলে বোঝা যাবে–এর মধ্য কী আছে। চাষী কুড়াল দিয়ে খুব জোরে বস্তার মধ্যে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে ভাল্লুকের মাথা ফেঁটে চৌচির হয়ে গেল। ভাল্লুক মরে গেল। শিয়াল বললো, চাষী ভাই, দেখলে তো–শুধু শক্তি থাকলেই হয় না, বুদ্ধিও থাকতে হয়। তাই তো বলি, শক্তির চেয়ে বুদ্ধিই বড়। আচ্ছা বেশ, আমি আজ চলি আগামীকাল সকালে তোমার বাড়িতে যাব। তুমি আমার জন্য মোরগ-মুরগী তৈরি রেখো।

পরদিন সকালে শিয়াল চাষীর বাড়ি এসে হাজির হলো। চাষী তখনো ঘুমে বিভোর। শিয়ালের ডাকাডাকিতে তার ঘুম ভাঙলো। সে ঘরের ভেতর থেকে শিয়ালকে বললো, ভাই! একটু অপেক্ষা করো, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

শিয়াল বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। চাষীর মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি এলো, সে ভাবলো–শক্তির চেয়ে যদি বুদ্ধিই বড় হয়, তাহলে আমিও একটু খাটিয়ে দেখি না। এই ভেবে সে ঘরের ভেতর থেকে কুকুরের মত 'ঘেউ' 'ঘেউ' করে উঠল। শিয়াল ডেকে বললো, চাষী ভাই! ওটা কিসের শব্দ? চাষী বললো, ওটা কিছু না, আমার দুটো শিকারী কুকুর আছে। ওরা তোমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে তো, তাই এমন করছে। চাষীর কথা শুনে শিয়াল ভয় পেয়ে গেল এবং সাথে সাথে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল। সে চাষীকে বললো, ভাই! তোমার কুকুরগুলোকে বড্ড ভয় লাগছে। তোমার মোরগ-মুরগী আমার দরকার নেই। আপাতত আমি আমার প্রাণ নিয়ে পালাই। এই বলে শিয়াল বনের মধ্যে ছুটে পালালো। চাষী হাসতে হাসতে বলতে লাগলো–শক্তির চেয়ে বুদ্ধিই বড়।

শিক্ষা : *বুদ্ধির জোরে যা সম্ভব, গায়ের জোরে তা সম্ভব নয়।*

হাঁড় কিপ্‌টে

গ্রামের চৌধুরী সাহেবের বিশাল বাড়ি। সবাই ডাকে 'কৃপণ চৌধুরী' বলে। কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। চৌধুরী সাহেবের কৃপণতা আছে। তা না হলে ২০০ বিঘা জমি, আর শ' খানেক গরু থাকার পরও কেন তার গোটা পরিবার গমের ভুষি খাবে? ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি।

চৌধুরীর পরিবারে ছিল তিন ছেলে, ছেলেদের বউ, তিন মেয়ে, তিন ঘরজামাই ও নাতি-নাতনি সবাই মিলে ৪০ জন। এদের খাওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল গমের রুটি, তাতে থাকতে হবে অর্ধেক ভুষি। গরু-বাছুর ও চাষাবাদ দেখার জন্য ছিল কয়েকজন কামলা। সকালে যখন সবাই এক সঙ্গে নাস্তার জন্য বসতেন এবং জামাই ও ছেলেরা ভুষির রুটি দুই/এক টুকরা মুখে দিয়েই উঠে যেত, তখন কৃপণ বুড়ো হাসতে হাসতে বলতো–এই রকম কম না খেলে কি সংসার চলে?

নাস্তা শেষ করে কৃপণ বুড়ো খুশি মনে মাঠে যেত। কামলা থাকা সত্ত্বেও

সে গরু-বাছুর দেখার জন্য মাঠে যেত। এই সুযোগে জামাই, মেয়ে ও ছেলেরা সবাই ভাল ভাল খাদ্য পাকাত এবং কৃপণ বুড়ো বাড়ি ফেরার পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া, ধোয়া-মোছা শেষ করত।

কৃপণ বুড়ো অন্য দিনের তুলনায় একদিন সময়ের আগে বাড়ি ফিরলো। ছেলে এবং জামাইদের খাওয়া শেষ হয়েছে। বউ ও নাতি-নাতনিদের খাওয়া শেষ হয়নি। এখন কী করবে? কৃপণ বুড়ো যদি দেখে ফেলে, তাহলে তো বিপদ! তখন তারা এক ফন্দি আঁটল যে, তারা বাড়ির দ্বিতীয় দরজার সামনে এক মুঠো সরিষা ছিটিয়ে দিল। প্রথম দরজা পার হয়ে যখন কৃপণ চৌধুরী দ্বিতীয় দরজায় পা দিল, পা দিয়েই চমকে উঠল এবং বলল–কোন্ উল্লুকের বাচ্চা এতগুলো সরিষা এখানে ফেলল? কারো গায়ে লাগে না বুঝি? বলেই সে বসে খুটতে লাগল একটা একটা করে সরিষার দানাগুলো এবং সব ক'টা সরিষা খুটে তুলে বাড়ি ঢুকল। এই সুযোগে বউরা খাওয়া-দাওয়া ও ধোয়া-মোছা শেষ করল। কিপটে বুড়ো কিছুই জানতে পারল না।

একদিন কিপটে বুড়ো অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থ অবস্থায় তার মাথায় চিন্তা জাগলো–তার মৃত্যুর পর ছেলেরা কী করবে? তিন ছেলেকে ডাকল সে। 'আমার মৃত্যুর পর তোমরা কী বরবে?' জানতে চাইল কৃপণ চৌধুরী। বড় ছেলে ভাবলো–তার বাবা অনেক ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে, কিন্তু কিছুই করেনি নিজের জন্য। এর কিছু বাবার জন্য খরচ না করে নিজেদের কাজে লাগানো উচিত হবে না। তাই বড় ছেলে বলল–বাবা! তোমার মৃত্যুর পর আমরা বড় ধরনের মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করব এবং তোমার নামে একটা স্কুল, একটা মাদরাসা, একটা মসজিদ বানাব। এতে যদি দশ বিঘা জমি বিক্রি করতে হয়, তাদের কোনো আপত্তি নেই। তোমার মৃত্যুর পর তিন মাস এলাকার গরীব-দুঃখীরা আমাদের এখানে খাবে...।

'হয়েছে হয়েছে আর না।' কথা শেষ না হতেই বড় ছেলেকে থামিয়ে দিল কৃপণ চৌধুরী। অত খরচ করলে থাকবেটা কী শুনি? কেউ আমার বাড়িতে বিনে পয়সায় খাক, তা আমি মোটেই চাই না।

দ্বিতীয় ছেলে ভাবলো–বড় ভাই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। একটু কমিয়ে বললে বাবা খুশি হবে। তাই সে বলল–বড় ভাই একটু বেশি বেশি

বলেছে। আসলেই তো, অত খরচ করলে আমরা পাবো কোথায়? আমরা তোমার মৃত্যুর পরে কেবল তিন দিনের জন্য কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করব, আর তোমার কবরটা বাঁধিয়ে দিবো ইট-সিমেন্ট দিয়ে। 'না, না, তা করো না' বলল কৃপণ চৌধুরী। ইট-সিমেন্টের যা দাম, তাতে কয়েক হাজার টাকা লেগে যাবে। আর কাঙ্গালী ভোজে কত খরচ হবে, তা জান? সারা বছরে যে চাল হয়, তার সবটাই তো খরচ হয়ে যাবে। তোমরা কি আমার গোটা পরিবারটাকে না খাইয়ে মারতে চাও?

পিতার ভাব-গতি বুঝে এগিয়ে এলো ছোট ছেলে। বলল–না বাবা, আমি ভাবছি অন্য কথা। তোমার মৃত্যুর পর আমরা একটা পয়সাও খরচ করব না। বরং তোমার মৃত্যু উপলক্ষে কিছু পয়সা কামাব। 'তাই নাকি বল দেখি কিভাবে?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৃপণ চৌধুরীর চোখ-মুখ। ছোট ছেলে বলতে লাগল–দেখো বাবা! তুমি বুড়ো হয়েছো বটে, কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাওনি। তোমার স্বাস্থ্য এখনও বেশ ভাল। গায়ে কম করে হলেও ১০০ কেজি গোশত হবে। আমরা কয়েক কেজি লবণ, আর সামান্য কিছু চিনি ব্যবহার করে অনেক লাভ করতে পারব। তোমার গোশত বিক্রি করব গরুর গোশত বলে। বিক্রির জন্য সবার বাড়ি বাড়ি যাবো। এতে কম করে হলেও সাত হাজার টাকা আসবে আমাদের হাতে। তখন বাবা বলল–ঠিক বলেছো! তুমি আসলেই বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু তুমি আমার গোশত নিয়ে দক্ষিণ পাড়ায় যেও না। 'কেন বাবা?' জানতে চাইল ছোট ছেলে। বাবা বলল–দক্ষিণ পাড়ার লোকেরা নগত বুঝে না, বাকি কিনতে চায়।

শিক্ষা : *কৃপণ লোকেরা সারা জীবন সম্পদ উপার্জন করে, কিন্তু সে নিজে তা খেতে পারে না। তাই আমরা যেন উক্ত ব্যক্তির মত কৃপণ না হই, বরং ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে আখিরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি।*

মিঠাইয়ের অভিযোগ

মিঠাইয়ের হাঁড়ি ধরেছে আড়ি–থাকবে বাড়ি। কেননা, হাট-বাজারে গেলে সকলেই উৎপাত করে। আসল খরিদ্দার হোক বা নকল খরিদ্দার হোক, দরাদরির বাহানায় সকলেই মিঠাই চাখার জন্য চাটাচাটি আরম্ভ করে। এ তার সহ্যের বাইরে। মিঠাইয়ের মালিক কিছুদিন যাবত তার এ আবদার বুঝতে পেরে তাকে হাট-বাজারে নেয়া থেকে বিরত থাকল।

ঈদের হাট সমাগত। এখন আর যাবে কোথায়? এতদিনের গচ্ছিত মিঠাই বেশি দামের আশায় হাটে গিয়ে উপস্থিত। দাম চড়া দেখে নকল খরিদ্দারের আনাগোনা বেশি। কেনাকাটা পড়ে থাক, চাখাচাখির হিড়িক পড়ে গেল। উচ্ছিষ্ট মিঠাই বাধ্য হয়ে মালিক ফিরিয়ে আনল বাড়িতে।

ঘটনাটা মিঠাইয়ের বরদাশ্‌তের বাইরে। তাই সে তার সহজাত অন্য মিষ্টান্ন যেমন–রসগোল্লা, সন্দেশ, জিলেপী ইত্যাদিকে আহ্বান করে ব্যাপারটা খুলে বলল। অন্যরা সমস্বরে বলল–আপনি আমাদের নেতা। এর একটা সুরাহা হওয়া উচিত। নববর্ষে হালখাতার অনুষ্ঠানে আমরাও রেহাই পাই না। পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত হল–আমরা একটা মামলা দায়ের করব। নিম্নকোর্টে সুবিচার না পেলে হাইকোর্টে এমনকি প্রধান বিচারপতির কাছে আমাদের অভিযোগ তুলে ধরব।

বিভিন্ন আদালতেও মিঠাই যে পায়, সে খায়। কোথাও সুষ্ঠু ফয়সালা না মেলার কারণে মিঠাই গিয়ে হাজির হল প্রধান বিচারকের সামনে। যেহেতু মিঠাইয়ের ঠাঁই খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মিঠাই বা মিষ্টির প্যাকেট দেখে লোভে ও খুশিতে চোখ দুটো ছলছল করছে প্রধান বিচারপতির। কিন্তু এ যে ফরিয়াদীর কাঠগড়ায়। তাই তৎক্ষণাৎ বিরত থেকে বিচারক ফন্দি এঁটে বললেন–মিঠাইয়ের অভিযোগ এখানে নয়, আমার স্পেশাল চেম্বার অথবা বাসায় গিয়ে হবে। অবশেষে ডাইনিং টেবিলে চড়ার আদেশ হল এবং বিচারক আপন চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলেন–বল তোমার অভিযোগ কী? সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, স্যার! আমি মিঠাই, কোথাও নেই আমার ঠাঁই। যে পায়, সে-ই খায়। একটু চিন্তায় পড়ে পুনরায় মিঠাইয়ের নিকট কারণ

জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে সে বলল–স্যার, আমি নাকি মিষ্টি। তাই আমাকে সকলেই ...।

কথা শেষ হতে না হতেই বিচারক মুচকি থেকে অট্টহাসি দিয়ে বললেন–ওরে, তাই নাকি? বলেই মিঠাই খেয়ে সাবাড় করে দিলেন।

দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে মিঠাইয়ের অভিভাবক মহলের পক্ষ থেকে নালিশ করা হল যে, কেন কেসের রায় দেওয়ার পূর্বেই মিঠাইকে তিনি গ্রাস করলেন? তাহলে কি মিঠাই সর্বাপেক্ষা স্বাদের বা মিষ্টি বস্তু? প্রধানমন্ত্রী নালিশ শুনে ঘোষণা দিলেন–প্রধান বিচারপতি বুঝতে মারাত্মক ভুল করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে মিঠাইয়ের চেয়েও মিষ্টি ও স্বাদের জিনিস হলো শাসনক্ষমতা। তাইতো যার হাতে ক্ষমতা আসে, সবাই তার চাটুকার সেজে তাকে চাটতে শুরু করে। সুতরাং প্রধান বিচারপতির শাস্তি স্বরূপ তার ক্ষমতা এক স্তর নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো। যেহেতু তিনি ক্ষমতার আসল মজা বুঝতে অক্ষম হয়েছেন। শাসনক্ষমতার স্বাদ বুঝতে সক্ষম হলে পুনরায় র‍্যাং বাড়বে।

শিক্ষা : *কিন্তু বর্তমানের শাসকরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে শাসন ক্ষমতার স্বাদ তিক্ত করে ফেলেছে।*

এখন শুধু ইনশাআল্লাহ

এক ব্যক্তি গরু কেনার জন্য হাটে যাচ্ছিল। রাস্তায় তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো–ভাই! কোথায় যাচ্ছ? সে বলল–গরু কিনতে হাটে যাচ্ছি। লোকটি বলল–ভাল কাজে ইনশাআল্লাহ বলতে হয়। সে বলল–এতে আবার ইনশাআল্লাহ বলার কী আছে? আমার পকেটে টাকা আছে, হাটে আছে গরু। যাবো আর কিনবো। তাতে আবার ইনশাআল্লাহ বলতে হবে কেন? বেচারা লোকটি তার কথা শুনে চুপ্ হয়ে গেল।

অতঃপর হাটে গিয়ে সে একটি গরু পছন্দ করল। দাম-দর ঠিক করে টাকা বের করার জন্য পকেটে হাত দিল। পকেটে হাত দিতেই হাত

একেবারে নিচের দিকে চলে গেল, পকেটে টাকা নেই। পকেট চোর তার পকেট কেটে টাকা নিয়ে গেছে। হায়রে! একি হলো? পকেট যে একেবারেই ফাঁকা। পকেটে হাত বুলাতে বুলাতে বাড়ির দিকে ফিরল সে। আর মনে মনে ভাবল–ইনশাআল্লাহ না বলায়ই আজ এ বিপদ হলো। তাই এখন থেকে আর ইনশাআল্লাহ ছাড়বে না বলে মনস্থ করল।

পথিমধ্যে পূর্বের স্থানে সেই লোকটির সাথে আবার দেখা হল। তাকে চিন্তিত দেখে সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল–কি ভাই! গরু কেনা হয়েছে? আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সে বলল–কী আর বলব ভাই ইনশাআল্লাহ। কেন ভাই কী হয়েছে? হাটে গেলাম ইনশাআল্লাহ। তারপর কি হলো? গরু পছন্দ করলাম ইনশাআল্লাহ। দাম ঠিক করলাম ইনশাআল্লাহ। টাকার জন্য পকেটে হাত দিলাম ইনশাআল্লাহ। কিন্তু পকেটমার পকেট কেটে টাকা নিয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ। তাই না কিনেই এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষা : *সব ভাল কাজে ইনশাআল্লাহ বলে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। কিন্তু এই লোকের মতো অপাত্রে ইনশাআল্লাহ বলা যাবে না।*

স্বয়ং বাদশাহর বাড়িতে চুরি!

সুলতান মাহমুদ গজনবী গভীর রজনীতে আরামের ঘুম হারাম করে প্রজাদের অবস্থা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। পরণে থাকতো জীর্ণ-শীর্ণ পোশাক। তাকে চিনে না এমন কোনো ব্যক্তি তাকে প্রথম দেখলে নিছক ভিক্ষুক-ফকির ছাড়া কিছুই ভাববে না।

একবার তিনি গভীর রজনীতে প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করার জন্য এক গভীর অরণ্যের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল–চারজন লোক এক সাথে দাঁড়িয়ে কি যেন আলাপ করছে। তারা আর কেউ নয়, ডাকাত দল। ডাকাতরা বাদশাহকে চিনতো না। তাই তাদের মধ্য থেকে একজন বাদশাহকে ডাকলো। বাদশাহ যখন তাদের কাছে

গেলেন, তখন তারা বাদশাহকে চোর মনে করে বলল, তুমি একা কি চুরি করতে পারবে? আমরা চারজন ডাকাত। চল, আমাদের সঙ্গে ডাকাতি করতে যাবে।

বাদশাহ রাজি হলে তারা বলল, আমাদের চারজনের চারটি বিশেষ গুণ আছে। সুতরাং আমাদের সাথে ডাকাতি করতে হলে তোমারও একটি বিশেষ গুণ থাকতে হবে। বাদশাহ বললেন–বলুন, আপনাদের বিশেষ গুণগুলো কী কী?

প্রথম ব্যক্তি বলল–আমার বিশেষ গুণটি হলো, যে বাড়িতে ডাকাতি করতে যাই , সে বাড়ির কাছে গিয়ে আমি হাত তালি দিয়ে বলতে পারি বাড়ির মূল্যবান জিনিসগুলো কোথায় আছে। অর্থাৎ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রুপা এবং হিরা-মনি-মুক্তা কোথায় কোথায় আছে, সে সন্ধান আমি দিতে পারি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল–আমার বিশেষ গুণটি হলো, যে বাড়িতে ডাকাতি করতে যাই, সে বাড়ির সব তালা আমি হাত দিয়ে ধরেই খুলে দিতে পারি। তাতে চাবির প্রয়োজন হয় না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল– আমার বিশেষ গুণটি হলো, যে বাড়িতে ডাকাতি করতে যাই, সে বাড়িতে কোন কুকুর থাকলে, কুকুর ঘেউ ঘেউ করে কী বলে, আমি তা বুঝি। চতুর্থ ব্যক্তি বলল, আমার বিশেষ গুণটি হলো, আমি রাতের অন্ধকারে যাকে দেখি, দিনের বেলায় তাকে স্পষ্ট চিনতে পারি। তখন তারা বলল, আমাদের বিশেষ গুণগুলো তো শুনলে। এখন তোমার বিশেষ গুণ কী বল।

বাদশাহ ছিলেন খুবই পাণ্ডিত্যসম্পন্ন লোক। তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, তোমাদের গুণগুলো ডাকাতির জন্য খুবই দরকারী। তথাপি আমার বিশেষ গুণটি তোমাদের গুণগুলো অপেক্ষা উত্তম। আমার বিশেষ গুণটি হলো, তোমরা চারজনের মধ্যে কেউ বিপদে পড়লে, আমি দাড়ি নাড়া দিয়ে বাঁচিয়ে দিতে পারব।

বাদশাহর বিশেষ গুণটি শুনে তারা খুশি হলো এবং বলল–এগুণটি খুবই প্রয়োজনীয়। এরপর তারা পরামর্শ করল, আজ রাতে কার বাড়িতে ডাকাতি করবে। পরামর্শ করে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, আজ রাতে সুলতান মাহমুদ গজনবীর বাড়িতে ডাকাতি করতে যাবে।

তারা যখন বাদশাহর বাড়ির কাছে পৌঁছল, তখন প্রথম ব্যক্তি হাত তালি দিয়ে বলতে লাগল, অমুক জায়গায় এত পরিমাণ টাকা, অমুক জায়গায় এত পরিমাণ স্বর্ণ-রুপা, হিরা-মনি-মুক্তা আছে। এভাবে বাড়ির মূল্যবান জিনিসপত্র কোথায় কোথায় আছে সব বলতে লাগল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তালা ধরে ধরে খুলে দিল। সবাই মালামাল বের করতে লাগল। বাদশাহ আঙ্গিনায় দাঁড়ানো। তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। বাদশাহ বললেন, কুকুরের ভাষা কে বুঝে, এদিকে আসো। তৃতীয় ব্যক্তি এসে বলল, আমি বুঝি। কিন্তু কুকুর যে কথা বলছে, আমি চিন্তা করছি। কুকুর বলছে, আমার কোনো চিন্তা নেই। তোমরা যার বাড়িতে ডাকাতি করতে এসেছ, সে বাড়ির মালিক তোমাদের সাথে। কিন্তু মালিক তো আমরা পাঁচজনের মধ্যে দেখছি না। তখন বাদশাহ বললেন–থাক, চিন্তা করে লাভ নেই।

তারপর তারা ডাকাতি করে মাল-সামানা নিয়ে ঐ অরণ্যে গিয়ে পৌঁছল, যেখানে তারা পরামর্শ করেছিল। এই গভীর অরণ্যের ভেতরে তারা ছোট্ট একটি ঘর নির্মাণ করে রেখেছিল। এখানে তারা মালামাল বন্টন করে শুয়ে থাকতো এবং প্রভাতে এখান থেকে বাড়িতে যেত।

সমস্ত মালামাল চার ভাগে বন্টন করে তারা চারজনেই নিল। তারা ফকিরবেশী বাদশাহকে বলল, আজকে যেহেতু তুমি প্রথম আমাদের সাথে ডাকাতি করছ, তাই আজকে তোমাকে ভাগ দেওয়া হলো না। আরেকদিন আমাদের সাথে ডাকাতি করলে আমাদের তুলনায় তোমাকে বেশি দেওয়া হবে। বাদশাহ রাজি হয়ে বললেন, তোমরা তো প্রভাতে এখান থেকে যাবে। আমার বাড়ি কাছে, আমি এখন চলে যাই। তারা ফকিরবেশী বাদশাহকে বিদায় দিয়ে দিল। বাদশাহ বাড়িতে এসেই উজিরকে তলব করলেন। উজির উপস্থিত হলে বললেন, আমার বাড়ির দারোয়ানদেরকে ডাক।

দারোয়ানরা উপস্থিত হলে শুধু মুখে বললেন-'বরখাস্ত'। বাদশাহর সামনে কথা উল্টানোর সাহস কারো নেই। সবাই চলে গেলে বাদশাহ উজিরকে বললেন, কমপক্ষে বিশজন সেনাবাহিনী নিয়ে আসো। সেনাবাহিনী উপস্থিত হলে তাদেরকে বললেন, তোমরা এখুনি গিয়ে অমুক অরণ্য ঘেরাও

করবে। তারপর আস্তে আস্তে ভেতরে প্রবেশ করবে। ভেতরে গিয়ে দেখবে একটি ছোট্ট ঘরে চারজন লোক চারটি গাটুলি শিয়রে রেখে ঘুমিয়ে আছে। গাটুলিসহ চারজনকেই গ্রেফতার করে নিয়েএসো।

বিশজন সেনাবাহিনী অরণ্য ঘেরাও করে আস্তে আস্তে ভেতরে যেতে লাগল। তারা যখন ঘরের কাছে পৌঁছল, তখন প্রভাত হয়ে গেছে। চার ডাকাত ঘুম থেকে উঠে বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিল। তারা যখন ঘর থেকে বের হলো, ঠিক তখনি সেনাবাহিনী সেখানে উপস্থিত হলো। তাদেরকে মালামালসহ গ্রেফতার করে বাদশাহর দরবারে উপস্থিত করল।

বাদশাহ তাদেরকে ফাঁসির হুকুম দিয়ে দিলেন। তাদেরকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। জল্লাদ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তাদের অন্তিম আশা কী? তিন ব্যক্তি কাঁদতে আরম্ভ করল, কিন্তু এক ব্যক্তি হাসতে লাগল। জল্লাদ বলল, আশ্চর্য ব্যাপার, মরণের ভয়ে তিন ব্যক্তি কাঁদছে আর তুমি কিনা হাসছো? হাসায়রত ব্যক্তিটি বলল, আমাদের অন্তিম আশা হলো, আমরা বাদশাহর সাথে একটু আলাপ করতে চাই। জল্লাদ বাদশাহর অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বাদশাহর সামনে নিয়ে এলো।

বাদশাহ বললেন, তোমাদের কী কথা, বল। তখন যে ব্যক্তিটি হাসছিল সে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বাদশাহকে বলল, হুজুর! আমরা যখন ডাকাতি করতে আসি, তখন আমাদের চারজনের চারটি বিশেষ গুণ ছিল। এর মধ্যে আমার বিশেষ গুণটি ছিল, রাতের অন্ধকারে যাকে দেখি, দিনের বেলা তাকে স্পষ্ট চিনতে পারি। আমার তো মনে হচ্ছে–রাতে ডাকাতির সময় আপনিও আমাদের সাথে ছিলেন। আপনাকে আমরা অরণ্যের পার্শ্ব থেকে চোর ভেবে আমাদের সাথে ডাকাতি করতে নিয়েছিলাম। আপনার বিশেষ গুণটি ছিল–আমাদের চারজনের কেউ বিপদে পড়লে, আপনি দাড়ি নাড়া দিয়ে বাঁচিয়ে দেবেন। এখন আমরা চারজনেই বিপদে পড়েছি। সুতরাং এখন আপনি আপনার ওয়াদা রক্ষা করুন।

বাদশাহ তখন মুচকি হেসে বললেন–হ্যাঁ, আমিও তোমাদের সাথে ছিলাম। এখন আমার ওয়াদা রক্ষা করতে পারি, তবে একটি শর্তে। শর্তটি হলো, তোমাদের এখন তাওবা করতে হবে যে, আর জীবনেও ডাকাতি

করবে না। তখন তারা সবাই তাওবা করল এবং অঙ্গীকার করল যে, জীবনে আর কখনই ডাকাতি করবে না। বাদশাহ দাড়ি নাড়া দিয়ে ইশারা দিলেন তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। তারা মুক্তি পেয়ে ভাল মানুষ হয়ে দিন কাটাতে লাগল।

শিক্ষা : *কোনো কাজে কাউকে সঙ্গী করার আগে তার পরিচয় জেনে নেয়া উচিত। তবে চুরি করা কিন্তু ভাল কাজ নয়।*

কথা লাগানোর যম

নাঈম একজন বিরাট ব্যবসায়ী। ব্যবসা নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয় তার। শুধু রাতের বেলা বাড়িতে থাকে, আবার সাত সকালে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যায়। বাড়ির তেমন খোঁজখবর রাখতে পারে না। তার স্ত্রীর একটি বদঅভ্যাস ছিল যে, সে সর্বদা একের গোপন কথা অন্যের কাছে বলে লোকদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি লাগিয়ে রাখতো। এ ব্যাপারে নাঈমের কাছে বার বার বিচার দায়ের করা হলো। কিন্তু সে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী বলে, ছিঃ ছিঃ আমি তো এসব পছন্দ করি না। এটা আমার অভ্যাস হবে কেমন করে? যদি এরকম কাজে জড়িত দেখেন তাহলে আমার জিব কেটে ফেলবেন।

নাঈম তার স্ত্রীকে পরীক্ষা করার জন্য একটি ফন্দি আঁটল। তার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাবিব। সে তার বন্ধুকে বলল–হাবীব! তুমি কিছুদিন বেড়ানোর জন্য অন্যত্র চলে যাও। কিছুদিন পর ফিরে আসবে। হাবিব অন্যত্র চলে গেল। নাঈম বাজার থেকে খাসি ক্রয় করে জবাই করে একটি থলের মধ্যে কিছু গোশত ভরে থলেটি বন্ধ করে দিল। থলের বাইরে সে কিছু রক্ত লাগিয়ে হাতে একটি ছুরি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। সে তার স্ত্রীকে বলল–দেখ, একটি কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না। আমার বন্ধু হাবিব আমার কাছে দু'লক্ষ টাকা পাবে। ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তাই তাকে হত্যা করে ফেলেছি। এ থলের মধ্যে তার গোশত। এগুলো আমাদের ঘরের খাঁটের নিচে

পুতে রাখছি। দেখ, এ কথা কাউকে বললে আমার জীবন চলে যাবে। এ বলে থলেটি নাঈম খাটের নিচে পুতে রাখল।

নাঈমের স্ত্রীর কি আর ঘুম হয়? সারাটা রাত তার ছটফট করে কাটল–কখন সে কথাটা ব্রাস্ট করবে? ফজরের আজান হতে ভরা কলসি নিয়েই ঘাটে গেল সে। নাঈমের বড় ভাবীকে পেয়েই বলল, ভাবী! একটি কথা বলি, কাউকে বলবেন নাতো! ভাবী বললেন–এসব কি বল? আমার প্রতি এমন সন্দেহ পোষণ করো না। নাঈমের স্ত্রী বলল–ভাবী! আপনার দেবর পশ্চিম পাড়ার হাবিব ভাইকে খুন করে আমাদের ঘরের খাটের নিচে পুতে রেখেছেন। দেখবেন, কাউকে যেন না বলেন।

ভাবী ঘরে গিয়ে তার স্বামীর কাছে সব খুলে বলল। তাও বলে দিল–দেখেন, কারো কাছে যেন না বলেন। নাঈমের ভাই তা শুনে লাফ দিয়ে উঠে বসল। আর মনে মনে ভাবল–তার তো ফাঁসি হবে, তাহলে শহরের বাসাটার মালিক আমি একাই হবো।

কিছুক্ষণ পর সে গ্রামের প্রভাবশালী দু'একজন মুরব্বীর বাড়িতে গেল এবং সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলে দিল। হাবিবের লাশ কোথায় আছে, তাও বলে দিল। আরও বলল–প্লীজ, আমি বলেছি বলে আমার নামটা উল্লেখ করবেন না। মুরব্বী ধরনের একজন লোক পুলিশের একটি দলকে খবর দিতেই পুলিশ বাড়িতে হাজির। খাটের নিচের থলেটা বের করা হল। সত্যিই দেখা গেল তা রক্তে রাঙা। পুলিশ নাঈমকে এরেস্ট করল। নাঈম কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, স্যার! আমার এখন কী হবে? ওসি বললেন–তোমার এখন ফাঁসি হবে। ফাঁসির কথা শুনে নাঈম কাঁদতে শুরু করল।

হাবিবের খুনের কথাটা এ গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। ওসি সাহেব খুনের ব্যাপারটা খুব গুরুত্ব দিয়ে রিপোর্ট লিখেছেন। থলের ভেতরটা দেখার জন্য তিনি একজন কনেস্টবলকে বললেন থলের মুখটা খোলার জন্য। থলের মুখটা খুলে কনেস্টবল বলল–স্যার! এটাতো আস্তা ছাগলের মাথা ও পা। হঠাৎ দেখা গেল হাবিবও কোথেকে যেন আসছে। তখন লোক সকল বলে উঠল–ঐ তো হাবিব।

ওসি সাহেব নাঈমকে জিজ্ঞেস করলেন–ব্যাপারটা কী? নাঈম উত্তর

দিল, স্যার! আমার স্ত্রীকে একটু পরীক্ষা করার জন্য এমন করেছি। নাঈম ওসির কাছে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলল। ওসি সাহেব নাঈমকে মুক্ত করে নাঈমের স্ত্রীকে ধরলেন। স্ত্রী ধরা পড়ে লা-জাওয়াব হয়ে গেল। নাঈম স্ত্রীকে তাওবা করালো জীবনে আর সে কথা লাগালাগি করবে না।

শিক্ষা : *কথা লাগানো অত্যন্ত মন্দ কাজ। এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে ঝগড়া-ঝাটি সৃষ্টি হয়।*

হরিণের বুদ্ধি

একদিন একটি হরিণ তার দু'টি বাচ্চা নিয়ে এক বন থেকে অন্য বনে যাচ্ছে। পথিমধ্যে রাত হয়ে গেল। তখন বাচ্চা দু'টি বলল, মা! এখন তো রাত হয়ে গেছে, আমরা এখন কোথায় থাকবো? তখন মা হরিণ বলল–আমরা এখন এই বনের এক ঝোপের মাঝে থাকবো। বাচ্চা দু'টি বলল–না! এ বনে বড় বড় বাঘ আছে। যদি আমাদের ধরে, তবে আমরা কী করবো? তখন মা হরিণ বলল, তোরা কোন চিন্তা করিস না। যখন বাঘ আসবে, তখন তোরা দু'জন বলবি মা, ও মা! বাঘ কখন আসবে? আমাদের খুব ক্ষুধা লেগেছে। আমরা বাঘকে খাব।

যখন সত্য-সত্যই বাঘ এলো, তখন বাচ্চা দু'টি বলল–মা, বাঘ কখন আসবে? আমরা বাঘকে খাব। আমাদের খুব ক্ষুধা লেগেছে। আমরা বাঘকে খাব। তখন বাঘ ভাবছে আর বলছে–এ বনে না জানি আমার চেয়ে বড় কে এসেছে, যে আমাকেই খেতে চায়। যখন বাচ্চা দু'টি আবার এই কথা বলল–তখন মা হরিণটি বলল, তোরা অধৈর্য হসনে। আরেকটু ধৈর্য ধর। এই তো কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে।

এই কথা শুনে বাঘ ভয়ে পিছিয়ে যেতে শুরু করল। তখন পথের মধ্যে চালাক শিয়ালের সাথে বাঘের দেখা হলো। চালাক শিয়াল বলল, মামা! ও মামা! এত জোরে দৌড়াচ্ছেন কেন? কোথায় যাবেন। তখন মামা বাঘ ভয়ে কাঁপছে আর বলছে? আমার কথা আর বলো না। এ বনে কারা যেন

এসেছে, তারা আমাকে খেতে চায়। তখন চালাক শিয়াল বলল–মামা! আমার সঙ্গে চলুন। দেখে নেব, কার এত বড় সাহস যে, আপনাকে খাবে।

বাঘ কিছুতেই যাবে না বলে বেঁকে বসল। শিয়াল অভয় দিয়ে বলল, বাঘ মামা! আমি আপনার সাথে সর্বদা থাকব। কোনো বিপদ হবে না। বাঘ বলল–আমিই যেখানে ভয়ে পালিয়ে এসেছি, তুমি তো আরো পালাবে। তখন শিয়াল একটা দড়ি নিয়ে এলো। দড়িটির একমুখে একটি ফাঁসি তৈরি করে নিজের গলায় দিল আর অপর মুখে একটি ফাঁসি তৈরি করে মামার গলায় দিল। শিয়াল বলল–এবার বিশ্বাস হল তো আমি যে তোমার সাথে আছি?

তখন শিয়াল আগে আগে চলতে লাগল আর বাঘ পিছে পিছে। যখন বাঘ ও শিয়াল হরিণদের কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন বাচ্চা দু'টি আবার পূর্বের মতো বলে উঠল। তখন মা হরিণ বলল–ও শিয়াল! একটা বাঘ নিয়ে এসেছ কেন? দু'টি আনার কথা যে! তখন বাঘ ভয়ে আবার দৌঁড়াতে শুরু করল। আর শিয়াল বাঘের সাথে দৌঁড়াতে না পেরে একবার এ গাছের সাথে আর একবার ও গাছের সাথে ধাক্কা খেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বাঘের সজোর টানে ফাঁসির প্যাচে আটকে গেল শিয়ালের গলা এবং তাতে সে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

শিক্ষা : *অতি চালাকের গলায় দড়ি।*

এক জোড়া পুরোতন জুতা

এক কৃপণ ব্যক্তির এক জোড়া চটি জুতা ছিল। সেটা যে কত বছর আগের কেনা, তাও কেউ বলতে পারত না। ছিঁড়ে যাওয়ায় সে এটা আর পরতে পারে না। পরবেই বা কি করে, গোটা চটি জোড়া তারকাটায় ভরা। তাই পায়ে দিতে গেলেই তা পায়ে ফুটে যেত। অবশেষে সে চিন্তা করল–একটা নতুন জুতা কিনবে, কিন্তু নতুন জুতা কিনতে তো অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে!

সে জুমার দিন মসজিদে গিয়ে হাজির হল। মসজিদের দরজার সম্মুখে

তার চটি জোড়া রেখে ভেতরে গেল। নামাযান্তে সে দোয়া করল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এক জোড়া জুতা দাও। দোয়া শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে সে হতবিহবল হয়ে পড়ল। দেখল তার চটির স্থানে এক জোড়া নরম বাদামী রংয়ের চটি জুতা। সে মনে করল–আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন। তাই সে তা পায়ে দিয়ে বাড়ি চলে এলো। আসলে এ সুন্দর চটি জোড়াটি ছিল গ্রামের মাতব্বরের। এক দুষ্ট ছেলে দুষ্টুমি করে কৃপণের জুতা সরিয়ে সুন্দর জুতা রেখে দিয়েছিল। মাতব্বর যখন নামায পড়ে বের হলেন, তখন তিনি দেখলেন–তার জুতা নেই। আশেপাশে খোঁজ করে ঐ ছেড়া জুতা পেলেন। কৃপণের জুতা সকলের চেনা থাকায় বুঝতে পারলেন এটা তারই কাজ।

পরের দিন জুতাসহ কৃপণকে ধরে আনা হলো এবং কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে তার চটি জুতা তাকে দিয়ে দিলেন। কৃপণ লোকটি মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে নদীর পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরতে লাগল। এক পর্যায়ে রাগ করে চটি জুতা জোড়া নদীতে ফেলে দিল।

কিছুদিন পর এক জেলে নদীতে মাছ ধরছিল। হঠাৎ সে অনুভব করল–বড় একটা কিছু বেঁধেছে। বোধ হয় বড় কোনো মাছ হবে। কিন্তু জাল উঠিয়ে দেখল যে, মাছতো দূরের কথা, গোটা জাল ছিড়ে একেবারে শেষ ঐ কৃপণ লোকটির ছেড়া জুতার পেরেকে বেঁধে। জেলেটা রেগেমেগে কৃপণের জুতা ও তার ছেড়া জালসহ হাজির হলো কৃপণের বাড়িতে। গিয়েই চটি জুতা ছুড়ে মারল কাচের গ্লাসের উপর। ব্যস চুরমার হয়ে গেল গ্লাস। জেলে বলল, বেশ করেছি। দেখতো আমার জালটাকে কিভাবে ছিড়ে ফেলেছে তোমার চটিজুতা? সে জুতা জোড়া তার গায়ে ছুড়ে মেরে চলে গেল।

এত অপমান এই চটি জুতার জন্য? কৃপণ লোকটির আর সহ্য হয় না। তাই চোখের সামনে থেকে দূর করার জন্য বাগানে গর্ত খুঁড়ে তাতে চটি জুতা পুঁতে রাখল। কিন্তু তার এক প্রতিবেশী দুশমন গর্ত করতে দেখে ভাব-ল–নিশ্চয় সে গুপ্তধন পুতে রাখছে। তখন সে সঙ্গে সঙ্গে দারোগার কাছে খবর দিল। খবর পেয়ে কৃপণ লোকটিকে দারোগার লোকেরা ধরে নিয়ে

গেল। সে যতই বুঝাতে লাগল, হুজুর! আমি গুপ্তধন রাখিনি, আমার ছেড়া চটি জুতা রেখেছি। কিন্তু কেউ তা বিশ্বাস করল না। অবশেষে অনেক টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে ছাড়া পেতে হল। সে ঐ চটি জুতা তুলে বলল, আর সহ্য করা যায় না। এবার একে পঁচা খালে না ফেললে চলবে না। তাই সে ওটা পঁচা খালে ফেলে বাড়ি ফিরল।

খালে ফেলে আর এক বিপদ ঘটল। খাল থেকে মেশিনের সাহায্যে নিচের পানি তোলার সময় চটি জুতা পাইপের মুখে আটকে পড়ল। আর পানির টানে তারকাটা খুলে মেশিনের মধ্যে ঢুকে মেশিন নষ্ট করে দিল। মালিক কৃপণ লোকটিকে ছাড়ল না। লোকজন ডেকে নালিশ করল। এবারও তাকে অনেক টাকা জরিমানা দিতে হলো।

এ চটির জন্য তার কত টাকা খরচ হয়ে গেল! অথচ সে কিনা খরচের ভয়ে এক জোড়া জুতা কেনেনি। এবার সে ঠিক করল, চটি জুতাকে ছাদের পেছনে ঝুঁলিয়ে রাখবে। এতে তার আর কোনো ক্ষতি হবে না। তাই জুতাজোড়া ছাদের পেছনে ঝুলিয়ে রেখে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এতে করেও সে শান্তিতে থাকতে পারল না। পাশের বাড়ির একটি কুকুর জুতা ঝুলতে দেখে ভাবল–এটা নিশ্চয় কোনো খাবার। এই মনে করে কুকুরটি লাফ দেয় কৃপণ লোকটির বাড়িতে। বাড়ির জানালা ভাঙা থাকায় কুকুর যেয়ে পড়ল কৃপণের নগ্ন পিঠে। কুকুরের নখের আঁচড়ে তার পিঠ থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে রক্তে ভেসে গেল সারা ঘর। তখন পাড়ার লোকেরা তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। অবশেষে অনেক টাকা লেগে গেল তার চিকিৎসার জন্য। এক জোড়া চটি জুতা তাকে অনেক ভোগালো। শেষ পর্যন্ত চটি দু'টিকে সে আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে দিল এবং প্রতিজ্ঞা করল–জীবনে আর কৃপণতা করবে না।

শিক্ষা : *কৃপণ লোকদের এ প্রতিজ্ঞা যেন আজীবন বহাল থাকে।*

বকের দুষ্ট বুদ্ধি

এক পাহাড়ের পাদদেশে একটি জলাশয় ছিল। বক, চিল সব এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতো। মাছ, কাঁকড়া ধরে ধরে খেত। একদিন একটা বুড়ো বক ফন্দি আঁটলো–কিভাবে মাছ আর কাঁকড়া খাওয়া যায়।

বক নদীর ধারে বসে কান্নাকাটি শুরু করল। তখন পাশ দিয়ে একটি কাঁকড়া যাচ্ছিল। বকের কান্না দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। বলল, ও বক নানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছো কেন? কী হয়েছে তোমার? বক বলল, কাঁদছি তোমার দুঃখে। সর্বনাশ হয়ে গেছে। জলাশয়ের পানিতে কে যেন বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। এখন আর কেউ এখানে বেঁচে থাকতে পারবে না। মাছ সব মরে যাবে। সব মরে গেলে আমি কী খাব? একথা শুনে কাঁকড়া তাড়াতাড়ি সব মাছকে খবর দিল।

তারা সব দলবেঁধে বকের কাছে হাজির। সকলে বককে বলল–দয়া করুন। আমাদের এমন বুদ্ধি দিন, যাতে আমরা বেঁচে যাই। খুব গম্ভীর হয়ে বক বলল–উপায় একটাই। যদি তোমরা আমার কথা মত চলো, তাহলে কারো কোনো বিপদ হবে না। মাছেরা সকলে এক সুরে বলল, আপনি যা বলবেন তা-ই করব। কখনও আপনার অবাধ্য হবো না। বক তার গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল, পাহাড়ের উপর একটা জলাশয় আছে। সেখানে তোমাদের রেখে আসতে পারি। মাছেরা উৎসাহের সাথে বলল, আমরা সবাই সেখানে চলে যেতে চাই।

এরপর প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা করে মাছ মুখে নিয়ে বক পাহাড়ের উপর উড়ে যেত, পরক্ষণে আবার নেমে আসত। এভাবে অনেকগুলো মাছ সে পাহাড়ের উপরে নিয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যে জলাশয়ের মাছ প্রায় সব শেষ হয়ে এলো। তখন কাঁকড়া এসে বলল, বেশ তো বক নানা। আপনার কথা শুনে আমি মাছদের ডেকে আনলাম। আপনি তাদের ব্যবস্থা করলেন। আর আমার কথা কিছু ভাবলেন না। শুধু মাছদের জন্য আপনার প্রাণ কাঁদলো? আমার কী দশা হবে, তা তো চিন্তা করলেন না।

বক তাকে অভয় দিয়ে বলল–কোনো ভয় নেই তোমাদের। তোমাদেরকে পাহাড়ের জলাশয়ে রেখে আসবো। সকলেরই তো বাঁচতে হবে। কালই সেই ব্যবস্থা করব। কাঁকড়া বললো–আমিতো প্রস্তুত।

পরদিন বক কাঁকড়াকে পিঠে নিয়ে চলল। চলছে তো চলছে, অবিরাম চলছে। পথ আর শেষ হয় না। কাঁকড়া দেখতে পেল–পাহাড়ের নিচে মাছের অনেক কাঁটা পড়ে আছে। খুবই ভয় পেল সে। বককে জিজ্ঞাসা করল, সেই জলাশয়টা আর কতদূর নানা? বক বলল, সেই জলাশয়টা আমার পেটে। সেখানে গেলে অনেক সুখে থাকবে। রোজ রোজ মাছ খেয়ে মুখ অরুচি হয়ে গেছে, আজ কাঁকড়া খেয়ে মুখটা পাল্টাবো।

কাঁকড়া ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মন শক্ত করল। প্রতারক মিথ্যুক বককে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। মরতে যখন হবেই তাহলে মেরেই মরি। নইলে কোনো উপায় নেই। এই বলে সে সজোরে বকের গলায় তার ধাঁরালো পা দ্বারা আটকে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যে বকের কলা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। বক যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

শিক্ষা : *লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।*

মতলববাজ শিয়াল

একদিন এক শিয়াল শিকার করতে গিয়ে আটকা পড়ল। লোকেরা শিয়ালকে একটি রশি দ্বারা বেঁধে ফেলে। চালাক শিয়াল বাঁচার উপায় নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। মানুষেরা যখন পরস্পর কথা বলছিল, তখন শিয়াল তার শরীরের সর্বশক্তি ব্যয় করে দৌড় দিল পালাবার উদ্দেশ্যে। হঠাৎ এক ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ল শিয়ালের দিকে। শিয়াল দৌড়ে পালাচ্ছে। তার হাতে ছিল একটি দা। সে সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের দা শিয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারল। তখন কোনোক্রমে শিয়াল বেঁচে গেলেও তার লেজ কাটা পড়ল।

মনের কষ্টে শিয়াল তার বন্ধু ও জাত ভাইদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে

চলতে লাগল। কিন্তু বন্ধুদের সাথে মেশা ছাড়া এতদিন কী করে থাকা যায়? ভেবে অবশেষে সে একটা ফন্দি বের করল। লেজহীন হয়েও শিয়াল তার ফন্দি অনুযায়ী মনের সুখে বুক ফুলিয়ে সবার সঙ্গে মিশতে লাগল।

তার ফন্দি মাথায় রেখে একদিন সে তার জাত ভাই সকল শিয়ালকে দাওয়াত করল। যখন সবাই একত্রিত হলো, তখন সে বলল–তোমরা সকলে বস, একটা জরুরী বিষয় নিয়ে আজ কথা বলবো। লেজ কাটা শিয়াল তখন শিয়াল জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিল, ভাইসব! তোমরা দেখ আমার লেজ নেই। অনেক ভেবে চিন্তে আমার লেজটা কেটে ফেলে দিয়েছি। আমি এখন যে স্বস্তি পাচ্ছি, সুবিধা পাচ্ছি, তা তোমাদের বুঝিয়ে শেষ করতে পারব না। আমার ইচ্ছে তোমরাও সেই সুবিধা ও আনন্দ ভোগ কর। আজকে তোমাদেরকে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে সমবেত করা হয়েছে শুধু তোমাদেরকে এ কথাটা বলার উদ্দেশ্যেই। ভাইসব! তোমরা ভেবে দেখ–লেজটা আমাদের শরীরের একটা অতিরিক্ত বোঝা স্বরূপ। শরীরের এই অতিরিক্ত অংশটা আমরা বোকার মতো বয়ে বেড়াচ্ছি। লেজের বোঝাটা না থাকায় এখন আমার শরীর কত যে হালকা লাগছে, কত যে সুবিধা পাচ্ছি, তা তোমরা তখনই বুঝতে পারবে, যখন আমার মতো তোমাদেরও লেজ কাটাবে।

তা ছাড়া দেখ আমাকে তোমাদের তুলনায় কত ছিমছাম দেখাচ্ছে। খরগোশের ধাওয়া খেয়ে গর্তের ভেতরে ঢুকতে গেলে লেজটা আর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। অনেক কাটার ঝোপেও ঢুকে যেতে পারি। কাটা-লতা লেজকে আঁকড়ে ধরতে পারে না। তাই আমি বলি, বন্ধুগণ! তোমরা সকলেই আমার মতো লেজহীন হয়ে যাও। আজ থেকে লেজহীন হবার শপথ গ্রহণ কর।

লেজহীন শিয়ালের বক্তৃতা শুনে শিয়ালের দল চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা বিষয়টা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু কী করবে, কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। তখন এক বুড়ো শিয়াল দাঁড়িয়ে উঠে বলল,

শোন ভাই! এই লেজহীন শিয়াল যে আমাদের উপদেশ দিচ্ছে, আমরাও যাতে তার মতো লেজ কেটে ফেলে দিই, এর কারণ আর কিছুই নয়, এই শিয়াল কোনো খারাপ কাজ করতে গিয়ে নিজের লেজটি খুইয়েছে। লেজহীন অবস্থায় আমাদের সঙ্গে চলতে সে লজ্জা পায়। আমরা যদি আমাদের লেজ কেটে ফেলে দিই, তাহলে সে বুক ফুলিয়ে চলতে পারবে। এই শিয়াল নিজের সুবিধার জন্য আমাদের শিয়াল জাতির ক্ষতি করতে চাচ্ছে। তাই বলি বন্ধুগণ, সাবধান! তোমরা কেউ এর কথায় ভুলেও লেজ কেটে ফেলে দিও না। নিজেদের ঐতিহ্য নষ্ট করো না।

শিক্ষা : *খারাপ লোকেরা চায় সবাই খারাপ হয়ে যাক। তাদের ব্যাপারে ভাল লোকদের সর্বদা সাবধান থাকা দরকার।*

ঠকটা বুঝলে রে!

সারাদিন ধরে কেবল বৃষ্টি ঝরছে। বিকেল বেলা বৃষ্টির জোর আরও বেড়ে গেল। বাতাসের বেগ যেন আরও বেশি হয়ে উঠল। গাব গাছের উপরে বাসা বেঁধে থাকত এক জোড়া পাখি–চটক আর চটকী। চটক বলল, চটকী! ভাগ্য ভালো, বাসাটা মজবুত করে বেঁধেছিলাম। নইলে বৃষ্টিতে ভিজে আমাদের হালুয়া টাইট হতে হত। চটকী বলল, আমিই তোমায় পরামর্শ দিয়েছিলাম। সেটা স্বীকার কর। চটক বলল, তা ঠিক।

এমন সময় সেই গাছের নিচে কিসের একটা শব্দ হলো। একটা বানর ভিজতে ভিজতে এসে গাব গাছের তলায় আশ্রয় নিল। চটক বলল, দেখ! দেখ গিন্নি! একটা বানর ভিজছে দাঁড়িয়ে। দেখনা–বানরটা শীতে কেমন ঠক ঠক করে কাঁপছে।

দেখে চটকীর বড় মায়া লাগল। মধুর সুরে সে বানরকে ডেকে বলল, ভিজছো কেন ভাই? নিজের বাসায় যাও। তা না হলে অসুখ-বিসুখ করে শেষে মারা যাবে। বানর রেগে বলল–তোর তাতে কী? আমি ভিজব, তুই

বলার কে রে? বাসায় আছিস চুপ করে ঘুমা। চটকী বলল, বলি–মানুষের মতো হাত-পা থাকতে একটা বাসাও বাঁধতে পারো না। আমরা ঠোঁট দিয়ে যা করতে পারি, তোমার এত বড় লম্বা লম্বা হাত-পা থাকতে কি তা করতে পারো না? বানর আরো বেশি রেগে বলল, আমি বাসা বানাই না, তোর তাতে কী? চটকী বিরক্ত হয়ে বলল, তবে তুই ভিজে মর। ভাল কথার কি আজ দিনকাল আছে?

বানর বলল, কী! তুই আমাকে মরতে বললি? তোর বাসার এত বড় অহংকার! দাঁড়া তোর বাসার মজা দেখাচ্ছি। এই বলে বানর তরতর করে গাছে উঠে চটকদের সাধের বাসাটা ভেঙে দিল। ওদের কষ্টের সীমা রইল না।

শিক্ষা : *মূর্খেরা উপদেশ তো পালন করেই না, উল্টো উপদেশদাতার ক্ষতি করে বসে।*

পাঞ্জাবী বনাম বাঙালী

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের মা-বোন, বাবা-ভাইদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। পশুর মতো ওরা আচরণ করেছিল। ওদের হাতে কত মা হারিয়েছে তার ছেলেকে, কত স্ত্রী হারিয়েছে তার স্বামীকে তার সঠিক পরিসংখ্যান বলা মুশকিল।

পাকিস্তানের পাঞ্জাব জাতির পুরুষ যোদ্ধারা যুদ্ধ করেছিল বলে আমরা তাদের পাঞ্জাবী বলে থাকি। পাঞ্জাবীরা নাকি খুব লম্বা ছিল। তখন ওদের নাম শুনলে সবার মনে শুরু হতো অজানা ভয় আর আতঙ্ক। ওরা আসছে শুনলেই যে যেদিকে পথ পেয়েছে, সেদিকে পালিয়েছে। কেউ ঢুকেছে লেট্রিনে, কেউবা ঢুকেছে বড় কোন গর্তে, কেউ এক গ্রাম থেকে পালিয়ে গেছে অন্য গ্রামে।

সে সময় এক ব্যক্তি পুকুর ঘাটে গোসল করে তার পাঞ্জাবী রেখে এসে

বউকে বলছে, 'এ্যাই! ঘাটে পাঞ্জাবী আছে, তাই...' কথা শেষ করার আগেই ভদ্র মহিলা ভয়ে এক চিৎকার মেরে ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে দৌড় শুরু করল এবং 'পাঞ্জাবী আইছে, পাঞ্জাবী আইছে' বলে শরীরের তামাম শক্তি দিয়ে দ্বিগুণ পরিমাণ দৌড়াতে লাগল। পেছন দিকে তার স্বামী ডাকছে এ্যাই, শুন! শুন! এই পাঞ্জাবী সেই পাঞ্জাবী নয়। দাঁড়াও তুমি। দাঁড়াও! কিন্তু কার কথা কে শুনে।

শুধু যে মানুষ ভয় পেয়েছিল তা নয়। বাঙ্গালীরা বীরবেশে যুদ্ধে শরীক হয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে হটিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী তথা পাঞ্জাবীদেরকে।

একদিন একগ্রামে কয়েকজন পাঞ্জাবী আসলে তারা একটি নাগা গাছে (মরিচ জাতীয়) নাগা দেখে বলল–এটা কী? এটা দিয়ে কী করা হয়? চতুর বাঙ্গালীরা তখন বুদ্ধি করে বলল, এটা শরীরে লাগানো হয় এবং এগুলো খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তখন তারা খুশি হয়ে কথামতো শরীরে লাগালো এবং বেশ কতগুলো খেলো। কিছুক্ষণ পর শুরু হলো জ্বালা-যন্ত্রণা। উহ্ আহ্ শব্দে মানুষের ভিড় জমে গেল চারপাশে। সহ্য না করতে পেরে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি শুরু করলো এবং শেষ পর্যন্ত গালিগালাজ করে ঐ গ্রাম ছেড়ে চলে গেল ওরা।

তেমনি নদী পার হতে হলে মাঝিরা ওদের নৌকায় তুলে মাঝনদীতে এসে নৌকা ডুবিয়ে দিত আর সেখানে মৃত্যুর সাথে তারা পাঞ্জা লড়ত। কারণ তারা সাঁতার জানতো না। এভাবে বিভিন্ন কৌশলে বাঙ্গালীরা ওদের হটিয়েছিল মহান বিজয়ের মাসে।

শিক্ষা : *মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন, তাদের জন্য আমাদের দোয়া করা কর্তব্য।*

সারাজীবন বসে খাবে

এক পর্যটক গ্রামে নতুন গেলেন ভ্রমণ করতে। অনেক পথ হাঁটার পর পর্যটক দেখতে পেলেন একটি নদী। এতে অনেক পানি। নদীতে একটি মাত্র নৌকা ছিল। নৌকাটি দিয়ে এক মাঝি সব যাত্রীকে পার করছে। পর্যটকের কাছে কোনো টাকা ছিল না। তিনি মাঝিকে বললেন, 'আমাকে একটু ওপারে নামিয়ে দাও না ভাই!' মাঝি বলল–'টাকা আছে? টাকা ছাড়া আমার নৌকায় আরোহণ করা যায় না।' পর্যটক বললেন, আমার কাছে কোনো টাকা নেই। তবে আমি তোমাকে এমন একটি জিনিস দিব, যার দ্বারা তুমি সারাজীবন বসে খেতে পারবে।

পর্যটকের কথা শুনে মাঝির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে অন্য সব যাত্রীকে নামিয়ে পর্যটককে নৌকায় তুলে ধীরে ধীরে নৌকা বাইতে লাগল। নৌকা অপর প্রান্তে ঠেকার আগেই মাঝি জিজ্ঞেস করল–কবে দেবেন আমার পাওনা? পর্যটক বলল, কাল ঠিক চারটার সময় এখানেই থাকবে। আমি এ পথ দিয়েই ফিরে যাব।

পর্যটককে নামিয়ে দেওয়ার পর থেকে মাঝির চিন্তা অন্য রকম হয়ে গেল। সে শুধু পাওনার আশায় ব্যাকুল। পরদিন সকাল থেকে নদীর ঠিক মাঝখানে নৌকা থামিয়ে বসে আছে মাঝি। এপার ওপার থেকে বহু যাত্রী ডাকাডাকি করলেও সে তাদের কোনো কথা শুনতে পারে না ভাবনায় ডুবে থাকার কারণে। শুধু ভাবছে–সারাজীবন বসে খাব! এমন পুরস্কার আমার ভাগ্যে?

সময় মতো মাঝি তার নৌকা ওপারে থামাল। মাঝি দেখল, একটি ব্যাগ হাতে সেই লোকটি আসছে। লোকটি নৌকায় উঠলে মাঝি বলল, আমার পাওনা দিন। পর্যটক বললেন, আমাকে আগে ওপারে নামিয়ে দাও তারপর দেব। মাঝি মনের সুখে নৌকা বাইছে।

ওপারে গিয়ে পর্যটক ব্যাগ থেকে একটি জিনিস বের করে মাঝির হাতে দিল। মাঝি অবাক হয়ে বলল, এটি তো কাঠের তৈরি পিঁড়ি। তখন পর্যটক বললেন, তোমার সাথে চুক্তি ছিল–সারাজীবন বসে খাবে এমন জিনিস দিব। তুমি তো সারা জীবন বসে খেতে পারবেই, তোমার ছেলেরাও এ পিঁড়িতে বসে খেতে পারবে। মাঝি 'থ' হয়ে তাকিয়ে রইল পর্যটকের মুখের দিকে।

শিক্ষা : *আগে ঠিক মতো বুঝে-শুনে তারপর কোনো কাজে চুক্তি করা উচিত।*

মিথ্যা ইনফরমেশন

র‍্যাবের প্রধান কার্যালয়ে একটা ফোন এলো। কচি কণ্ঠে বলছে–'হ্যালো! এটা কি র‍্যাব? আমার কাছে একটা গোপন তথ্য আছে।' হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন! র‍্যাবের টেলিফোন অপারেটর ব্যস্ত হয়ে উঠল। গোপন তথ্যের কণ্ঠটা তার এলাকার বিবরণ দিয়ে জানাল, 'ওই এলাকায় চৌধুরী বাড়িটা আছে না? বাড়ির মধ্যে একটা পুকুর আছে। পুকুরের নিচে অস্ত্র লুকানো আছে।'

র‍্যাবের টেলিফোন অপারেটর 'অসংখ্য ধন্যবাদ, আমরা এক্ষুণি দেখছি' বলে ফোন রেখে দিলেন। আধা ঘন্টা বাদেই সংশ্লিষ্ট চৌধুরী বাড়ির সামনে কড়া ব্রেক করে দাঁড়িয়ে গেল র‍্যাবের তিনটা সাদা রঙ্গের জিপ গাড়ি। লাফ দিয়ে সেখান থেকে নামলেন একদল কালো চশমা আর কালো পোশাক পরা র‍্যাব সদস্য। তাদের কয়েকজন ব্যস্ত হয়ে পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেললেন। বাকিরা দেয়াল টপকে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। সঙ্গে করে তারা ডুবুরি নিয়েই এসেছিলেন। সেই ডুবুরি নেমে গেল পুকুরের পানিতে। কিন্তু পুরো এক ঘণ্টা পানিতে কাটিয়েও তারা পানির নিচ থেকে অস্ত্রের মতো কিছু বের করতে পারলেন না। চৌধুরী সাহেব নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি বিস্ময়ে পাথর হয়ে তার বাড়িতে র‍্যাবের আনাগোনা দেখছেন। তার বিস্ময় এক পর্যায়ে শোকে রূপান্তরিত হলো। কারণ ডুবুরি দিয়ে ফল না পেয়ে র‍্যাব কমান্ডার পুরো পুকুরের পানি সেঁচে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। কোথা থেকে এত তাড়াতাড়ি পানির পাইপ, পাম্প মোটর ইত্যাদি ম্যানেজ হলো কে জানে?

র‍্যাবের লোকজন ধৈর্য নিয়ে পুকুরের পানি সেঁচে ফেলতে শুরু করল। কাজটা যত সময় সাপেক্ষ হবে বলে ভাবা হয়েছিল, বাস্তবে দেখা গেল কাজটা অনেক দ্রুতই করা গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই র‍্যাব বাহিনী পুকুরটাকে পানি-মুক্ত করে শুকনো বানিয়ে ফেলল। দেখে মনে হলো–এখানে কোনো কালে পানিই ছিল না। হয়ত সম্প্রতি পৃথিবীর বাইরে থেকে কোনো উল্কাপিণ্ড এসে আছড়ে পড়ায় এখানে এত বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

চৌধুরী সাহেব বিছানা নিলেন। জরুরী তলব পেয়ে তার ব্যক্তিগত

চিকিৎসক এসে তার সেবা-যত্নের ভার নিলেন। র‍্যাব সদস্যরাও বিদায় নিল। কোনো অস্ত্র তো দূরে থাক, মাছ ধরার কোনো বড়শীও পাওয়া যায়নি। তারা অবশ্য যাওয়ার আগে নরম গলায় 'আমরা খুবই দুঃখিত, আসলে ইনফরমেশনটা মনে হয় ভুল ছিল' বলে সান্ত্বনা দিয়ে গেল।

র‍্যাব চলে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর চৌধুরী সাহেব বাড়ির প্রধান ফটকে উঁকি দিলেন। সেখানে দেখতে পেলেন পাড়ার কয়েকটা ছেলেকে। কী চাই? কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল বাড়ির দারোয়ান। 'না মানে ...' মাথা চুলকে জবাব দিল তাঁদের একজন–'গতকাল বিকেলে আমার ক্রিকেট বলটা না ওই মাঠ থেকে উড়ে এসে পুকুরে পড়েছে। ইয়ে... আমরা একটু খুঁজে দেখি পাই কি না?

শিক্ষা : *এভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কাউকে ভোগানো উচিত নয়। আর নির্ভরযোগ্য তথ্য না পেয়ে এভাবে অভিযান চালানোও ঠিক নয়।*

ছাগল–ভেড়ার বুদ্ধি

এক ব্যক্তির ছিল একটি ছাগল আর একটি ভেড়া। তাদের মধ্যে ছিল খুব বন্ধুত্ব। ছাগলের ছিল খুব বুদ্ধি। প্রচুর সাহস। আর ভেড়ার বুদ্ধি ও সাহস কম ছিল। তারা দু'জন যে দিকেই যেত এক সাথেই যেত। ছাগল যদি কারো একটি শস্য ক্ষেত খেত, অমনি ভেড়া গিয়ে সবগুলো শস্য নষ্ট করে ফেলতো। এই ছিল ছাগল আর ভেড়ার প্রতিদিনের কাণ্ড।

একদিনের ঘটনা। ছাগল এক কৃষাণের ক্ষেতের একটি সবজি গাছ খেয়ে ফেলল। সাথে সাথে ভেড়া গিয়ে সবগুলো সবজি ভেঙে নষ্ট করে ফেলল। ক্ষেতের মালিক এসে ভেড়া আর ছাগলের কাণ্ড দেখে তাদেরকে হাতে-নাতে ধরে ফেললো। অতঃপর ছাগল ও ভেড়াকে নিয়ে গেল তাদের মালিকের কাছে। দিল তার কাছে নালিশ।

এরকম ঘটনা আরো কয়েক দিন ঘটল। এভাবে মালিকের কাছে প্রায়ই

নালিশ আসতে লাগল। একবার মালিক রাগে-ক্ষোভে ছাগল ও ভেড়াকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। দু'বন্ধু ছাড়া পেয়ে মনের সুখে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে তারা গিয়ে উপস্থিত হল এক গভীর অরণ্যে। তারা আরেকটু সামনে এগুতেই সামনে পেল একটি বস্তা। আরেকটু দূরে পেল বাঘের মাথার কংকাল। তখন পাটের ছালার মধ্যে বাঘের মাথার কংকালটি ভরে ভেড়া কাঁধে নিল। অতঃপর তারা পুনরায় হাঁটতে লাগলো। কিছুদূর যেতেই তাদের সামনে পড়লো তিনটি বাঘ। ভেড়াতো বাঘ দেখে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। ছাগল ভেড়ার অবস্থা দেখে তাকে অভয় দিয়ে বলল–বিপদে ভয় পেতে নেই। বিপদ-আপদে মনে সাহস রাখতে হয়। মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করো। ছাগলের কথা শুনে ভেড়া মনে কিছুটা সাহস পেল। ছাগলের কথামত তার পিছু পিছু চলতে লাগলো।

শীতকালের দিন। তাই বাঘ তিনটা বসে পানি গরম করছিল খাওয়ার জন্য। ছাগল ও ভেড়াকে দেখে বাঘদের মধ্য থেকে একটা বাঘ বলে উঠলো–এই! তোরা কারা? আমাদের সামনে আয়। তোদেরকে মজা করে খাব। আমাদের পেটে ভীষণ ক্ষিদে।

ভেড়া তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসেই পড়ল বাঘের কথা শুনে। ভেড়ার অবস্থা দেখে ছাগল তাকে ইশারা করল ভয় না পাওয়ার জন্য। ছাগলও ভয় পেল, কিন্তু প্রকাশ করলো না। সে ভাবলো–ভয় পেলে চলবে না। যেভাবেই হোক বিপদ থেকে বাঁচতে হবে। তাই সাহস করে সে বললো–আমরা তোদের যম। পিছনে তোদের মতো অনেক বাঘকেই আমরা খেয়েছি। এবার তোদের খাব।

ছাগলের কথা শুনে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল বাঘ তিনটা। তবুও একটা বাঘ সাহস করে বললো–তোরা যে আরো বাঘ খেয়েছিস, তার কোনো প্রমাণ আছে?

অবশ্যই আছে–এই বলে ছাগল ভেড়াকে বলল–ভাইয়া! বস্তার মধ্য থেকে বাঘের কল্লাটা বের করো তো। ভেড়া ছাগলের কথা মতো বাঘের

মাথাটা বের করল। ছাগল বলল–এটা না, আরো বড়টা বের করো। ভেড়া বাঘের মাথাটা বস্তার ভেতর রেখে আবার সেটাই বের করলো। ছাগল আবারো বললো, এটা নয়, আরো বড়টা। ভেড়া শুধু একটা মাথাকেই বার বার রাখে আর বের করে। আর ছাগল বার বার বলে–এটা না, আরো বড়টা।

এ অবস্থা দেখে একটা বাঘ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে পায়খানার কথা বলে চলে গেল। অনেকক্ষণ হল সে আসছে না দেখে বাকি দুটোর পেটে আমাশয় শুরু হয়ে গেল। অপর বাঘ ভয়ে পালানোর জন্য বললো–দেখি, ও যে গেল, আসছে না কেন? এই বলে সেও চলে গেল। গেলতো গেলই, আসার কোনো নাম গন্ধও নেই। বাকিটা পড়ল মহাবিপাকে। সেও বাঁচার জন্য বললো– ওরা যে গেল, দেখি এখনো আসছে না কেন? এই বলে সেও চলে গেল।

ভেড়া আর ছাগল তাদের কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে যেন মটিতে লুটিয়ে পড়ে। যাক, তারা এতক্ষণ পর যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। অতঃপর বাঘদের গরম করা পানি তারা দু'জনে খেয়ে মনের সুখে আবার হাঁটতে লাগলো। এক সময় সন্ধ্যা নেমে এলো। তারা এ অরণ্যের দিগ-দিগন্ত কিছুই চিনে না। তাই বিরাট এক গাছে শোয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ছাগল গাছের মগডালে উঠে বসল আর ভেড়া নিচের ডালে বসল। এক সময় ঘুমের রাজ্যে চলে গেল তারা।

এদিকে বাঘ তিনটা এক জায়গায় একত্রিত হল। বাঘদের মধ্য থেকে একজন বললো–আমরা এত বোকা! তারাতো ছিল দু'জন, আর আমরা ছিলাম তিনজন। তাদের ভয়ে আমরা চলে এলাম কেন? মনে হয় আমাদেরকে তারা মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে। বাকি দু'বাঘ বলল–চল, ওদেরকে ধরি। এবার আর তাদের রক্ষে নেই। পাওয়া মাত্রই খেয়ে ফেলবো। এই বলে তারা পূর্বের জায়গায় গিয়ে ছাগল ও ভেড়াকে খুঁজলো। কিন্তু পেল না। সারারাত খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে ছাগল-ভেড়া যেই গাছে ঘুমাচ্ছে, সেই গাছের

নিচে তারা শুয়ে পড়ল।

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠলো বাঘ তিনটা। বাঘদের চোখ উপরের দিকে যেতেই মহানন্দে ধেঁই ধেঁই করতে লাগলো। তাদের চেচামেচিতে ঘুম ভাঙল ছাগল ও ভেড়ার। ওদের দেখে ছাগল ভয় পেলেও নিজেকে সংযত করলো। আর ভেড়া রীতিমতো ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

বাঘ রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল–তোদের আর নিস্তার নেই। এবার বুঝবি মিথ্যে ভয় দেখানোর মজা! এই বলে বাঘটা গাছে ওঠার জন্য লাফালাফি করতে লাগল। ছাগল ভয় না পেয়ে তাদের কাণ্ড দেখছিল। আর ভেড়া সে তো কাঁপতে কাঁপতে বাঘের পিঠের উপর পড়েই গেল।

অবস্থা দেখে ছাগল বুদ্ধি করে বলল–ভাইয়া! একটা একটা করে আমার কাছে ছুঁড়ে মারো। এবার এদের আস্তা গিলে খাব। একথা শুনে বাঘেরা ভাবলো–তাদের ধরতে হয়তো ভেড়া গাছ থেকে নেমেছে। এ কথা ভাবা মাত্রই বাঘ তিনটি ভয়ে দিল দৌড়। তাদের আর পায় কে?

শিক্ষা : *কোনো কোনো সময় দুর্বল হওয়ার পরও বুদ্ধির গুণে রক্ষা পাওয়া যায়।*

শিয়ালের আঙ্গুর খাওয়া

এক জঙ্গলে একটি আঙ্গুর গাছ ছিল। গাছে তখন আঙ্গুর পেকে টুসটুস করছে। সেই গাছের নিচেই বসেছিল একটি বানর। হঠাৎ বানর উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল পাকা আঙ্গুর। দেখামাত্রই তার জিহ্বায় পানি এসে গেল। আর তখনই লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়লো। সে মনের আনন্দে পাকা আঙ্গুর খেতে লাগল।

এদিকে শিয়াল আড়ালে বসে সবকিছুই দেখছিল। এসব দেখে তার সহ্য হচ্ছিল না। এক পর্যায়ে সে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য মনে মনে বলল–'আঙ্গুর ফল টক।' কিছু সময় পর তার মন আবার আঙ্গুর ফলের জন্য উতলা হয়ে উঠল। সে মনে মনে নিজের কথাকেই নিজে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করে বলল–যদি আঙ্গুর ফল টক হয়, তাহলে বানর সেই আঙ্গুর এতো মজা করে খায় কী করে? সে ভাবতে লাগল–বানর গাছে বসে আঙ্গুর খাবে, আর আমি বসে বসে দেখব তা হতেই পারে না। বুদ্ধি একটা বের করতেই হবে।

ফন্দি এঁটে শিয়াল আঙ্গুর গাছের নিচে গিয়ে করুণ কণ্ঠে কাঁদতে লাগল। বানর শিয়ালের কান্না শুনে বলল–হিংসুটে, ধোঁকাবাজ! আবার আমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছো? শিয়াল বলল–আপনার সাথে ধোঁকাবাজি করে আমার কী লাভ হবে? আপনি হলেন উঁচু পর্যায়ের পশু, আর আমি হলাম নিম্নমানের পশু। আপনার সাথে ধোঁকাবাজি করা কি আমার জন্য শোভা পায়?

শিয়ালের কথায় বানরের মন গলে গেল। সে অত্যন্ত স্নেহের সাথে বলল–কী হয়েছে তোমার? এভাবে কাঁদছো কেন? একটু খুলে বলো। শিয়াল বলল–আপনার কাছে বলে কী লাভ হবে? বানর বলল–আরে, বলো না। দেখি কোনো উপকার করতে পারি কি না।

শিয়াল বলল–দুঃখের কথা কী বলব ভাই, বনের পশুরা জেদ ধরেছে–তাদেরকে নাচ দেখিয়ে মুগ্ধ করতে হবে। এখন আমি কী কবর? আমি তো নাচতে পারি না। আমাকে নাচ শিখিয়ে দাও না।

বানর বলল–ও, সেই কথা। এর জন্য আবার কাঁদতে হয় নাকি? দাঁড়াও, এখুনি আমি নাচ শিখিয়ে দিচ্ছি। একথা বলেই সে গাছে থেকেই নাচতে আরম্ভ করল। তার ঝাকুনিতে পাকা আঙ্গুরগুলো নিচে পড়তে শুরু করল। আর শিয়াল আঙ্গুরগুলো তুলে খেতে লাগল। কিন্তু বানরের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। শিয়াল যখন দেখল–আঙ্গুর শেষ হয়ে গেছে, তখন এক দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

বানরের নাচ যখন শেষ হল, তখন সে গাছের দিকে তাকাল। তাকিয়েই তার মাথায় হাত। গাছে যে একটিও আঙ্গুর নেই। তখন সে নিজেকে বোকামীর জন্য ধিক্কার দিতে লাগল।

শিক্ষা : *আমাদের সমাজেও কেউ কেউ এভাবে শিয়ালের মতো চালাকি করে স্বার্থ ফুরিয়ে কেটে পড়ে।*

বন্ধু দোষে

এক ছিল কুকুর। কুকুরটি খুব সুখেই ছিল। গ্রামের সকলেই দয়া করত তাকে। ফলে সে পেতো ভাল ভাল খাবার। যেখানেই যেত, সবাই তাকে কিছু না কিছু খাবার দিত। আর কোনো অনুষ্ঠান হলে সব হাড্ডি ও ঝুটা তার ভাগ্যেই জুটতো। যার দরুণ কুকুরটি অল্প দিনেই বেশ মোটা হয়ে উঠল। এতে কুকুরটি মহাখুশি।

একদিন কুকুরটি একটি ঝোঁপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার সাথে দেখা হল এক শিয়ালের। শিয়াল বলল–কিরে দোস্ত, খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে! কুকুর আনন্দিত হয়ে বলল–ঠিকই বলেছিস বন্ধু! খুব সুখেই আছি। খাওয়ার কোনো অভাব নেই। থাকা-চলাফেরার অনেক সুবিধা। তাছাড়া কোনো উত্তম মধ্যমও কেউ দেয় না। যার দরুণ বেশ সুখেই কাটছে আমার দিনগুলো। শিয়াল বলল–তোর ভাগ্যই ভাল দোস্ত। যত্তোসব পোড়া কপাল আমার। দিনে তো বের হতেই পারি না, যদিও রাতে বের হই, তবুও, মানুষের ধাওয়া খেতে হয়। কুকুর বলল–তোর তো দুর্দশা হবেই। তুই মানুষের কষ্ট করে পালিত হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া চুরি করে খাস। এর জন্যই কেউ তোকে দেখতে পারে না। শিয়াল বলল–বন্ধু! আমাকে তোর সঙ্গে নিবি কি? আমি তোর কাছে ওয়াদা করলাম–আর কোনো দিন মানুষের ওসব চুরি করে খাব না। তোর সাথে থাকব। তোকে যা খাবার দিবে। আমি তা-ই খাব। বন্ধু! দয়া করে তোর সাথে আমাকে নে। নইলে চুরি করে খেয়ে আমার প্রাণ বাঁচে না। বন্ধু! আমার প্রতি একটু দয়া কর!

শিয়ালের কাকুতি-মিনতি দেখে কুকুরের মনে দয়া হল। সে মনে মনে ভাবল–আমি একা একা এতো কিছু খেয়ে শেষ করতে পারি না। শিয়ালকে সঙ্গে নিলে দুই বন্ধু মিলে খাওয়া যাবে। বেচারা অসহায় অবস্থায় পড়েছে। তাই কুকুর বলল–ঠিক আছে, চল্ বন্ধু! আজ থেকে আমার সাথে থাকবি। চল্ গ্রামে যাই।

কুকুর ও শিয়াল কিছুক্ষণ চলার পর কয়েকজন মানুষ সামনে পড়ল। তারা তো অবাক! কুকুরের সাথে শিয়াল এই দিনের বেলা! তারা লাঠি দিয়ে শিয়াল আর কুকুরকে দিল তাড়া। শিয়াল দিল ভো দৌড়। এক দৌড়ে জঙ্গলে চলে গেল। এদিকে কুকুরকে আচ্ছা মতো পেটাতে লাগল লোকেরা।

তখন কুকুর বলল–আমাকে এভাবে মারছেন কেন? আমি কী অন্যায় করেছি আপনাদের সাথে। লোকেরা বলল–এতো দিন তোকে ভাল মনে করেছিলাম। কিন্তু আজ দেখি তুই আমাদের শত্রুর সাথে মিল দিয়েছিস। ওকে সাথে করে এনেছিস আমাদের হাঁস-মুরগী খাওয়ানোর জন্য। আজ তোকে ছাড়া হবে না। তোকে মেরেই ফেলবো।

তখন কুকুর বুঝল–নিজের জাতিকে ছেড়ে আমি অন্য জাতির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি বলে আজ আমার এই অবস্থা। আজ যদি আমার জাতি ভাইকে সাথে নিয়ে আসতাম, তাহলে কেউ আমাকে কিছু বলত না। আমার নিজের শত্রু এবং মানুষের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করায় আজ আমার এই পরিণতি!

শিক্ষা : *আজ মুসলিম জাতিও বিধর্মীদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে অধঃপতনে যাচ্ছে।*

ছদ্মভঙ্গ করে প্রতিশোধ

এক ছিল আখচাষী। সে ছিল ভীষণ চালাক। একদিন সে তার আখের জমিতে গিয়ে দেখল–চারজন ভদ্রলোক জমি থেকে আখ খাচ্ছে। কিন্তু তারা সেই মালিক বেচারাকে একা দেখে পালাবার চেষ্টাই করল না।

চাষী মালিকের ইচ্ছা–তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেবে। কিন্তু তা খুব কঠিন। এমনকি একদম অসম্ভব বটে। কেননা তারা চারজন। তাই বেচারা চাষী অভিনব কৌশল গ্রহণ করল। আখচাষী তাদের নিকট গিয়ে তাদেরকে

অভয় দিয়ে তাদের সাথে মিশে গেল। চারজনের মধ্যে একজন ছিল অন্য জেলার, দ্বিতীয়জন অন্য উপজেলার, তৃতীয়জন অন্য গ্রামের এবং চতুর্থজন ছিল তার গ্রামের।

আখচাষী সুযোগমত অন্য জেলা থেকে আগতকে লক্ষ্য করে বলল–আরে, ঐ তিনজন আমার এলাকার লোক। আমার জিনিসের উপর তাদের অধিকার আছে। তারা আমার আখ খেতে পারে। কিন্তু তুমি অন্য এলাকার মানুষ হয়ে কেন আমার আখ খেতে এসেছ? তোমার এ অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়। তবু তুমি বিদেশী মানুষ। তোমাকে ছেড়ে দিলাম। সসম্মানে তাড়াতাড়ি কেটে পড়। অন্য তিনজনও বলল–ঠিকই তো সরে পড় তাড়াতাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি সেখান থেকে চলে গেল।

এরপর অন্য উপজেলার লোকটিকে চাষী বলল–তুমি অবশ্যই খারাপ লোক। বুদ্ধি-সুদ্ধিও একেবারেই কম। তা না হলে অন্য উপজেলা থেকে এসে এদের সাথে মিশে গেলে কেন? তোমার বোঝা উচিত ছিল–এরা আমাদের নিজেদের লোক। তারা আখ খাবে, তা খেতেই পারে। তাদেরকে হয়ত কিছু বলা যাবে না। কিন্তু তুমি অন্য উপজেলার লোক। জনগণ তেড়ে আসলে আর রেহাই নেই। তাড়াতাড়ি পালাও। তখন তার সাথের দু'জনও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অগত্যা সে মুখ কালো করে চলে গেল।

এদের অবস্থা দেখে অপর দু'জন শান্তির ঢেকুর তুলে ব্যঙ্গ করে হেসে বলল–দেখ শালারা, অন্য জায়গা থেকে এসে আখ খাওয়ার মজা কেমন?

তারপর আখ চাষী তৃতীয় জনকে লক্ষ্য করে বলল–আরে বদমায়েশ, তুমি কি জান না যে, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর অনেক হক আছে? তাই আখ খেলে কেবল আমার প্রতিবেশী গ্রামের লোক খেতে পারে? কিন্তু সেখানে তুমি অন্য গ্রাম থেকে এসে কেন খাবে? দাঁড়াও তোমার আখ খাওয়ার মজা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ বলে তাকে তাড়া করল। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে পালাল।

এবার চাষী একা পেয়ে গেল গ্রামের আখ চোরকে। তখন আখচাষী তাকে আচ্ছামতো কিল-ঘুষি লাথি মারতে মারতে বলল–বেটা! বেড়ায় ফসল খেলে

চলবে কী করে? ওরা বাইরের লোক চুরি করতে পারে, কিন্তু তুই আমার গ্রামের লোক হয়ে তাদের নিয়ে চুরি করতে এলি কী করে? শালা! তুই হচ্ছিস বড় চোর। তোকেই বেশি শাস্তি দেওয়া দরকার। এই বলে কৃষক তাকে আচ্ছামতো মারপিট করলো। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

এভাবে চাষী একে একে চারজনের ঐক্য শক্তিকে ভেঙে তার উদ্দেশ্য পূরণ করল।

শিক্ষা : *আজকের মুসলমানদেরকেও কাফিররা এভাবে বিভক্ত করে এক এক করে ঘায়েল করছে। মুসলমানদের এ ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত।*

আজরাইলের আগমন!

জনৈক জেলের খুবই জঠিল রোগ হয়েছে। সারাদিন বিছানায় পড়ে হা পিত্যেশ করে। হাঁটা-চলা কিছুই করতে পারে না। রোগটা দিন দিন শুধু বাড়ছে। জেলে উহ্ আহ্ করে আর কাঁদে।

জেলের অবস্থা দেখে জেলের বউ ভাবল–জেলে তো আর বাঁচবে না। মরার আগে তাই সে একটু দরদ দেখাতে শুরু করল। এই পর্যায়ে জেলের বউ জেলের সামনে সবসময় বলতে থাকল–'আল্লাহ গো, উনারে ভাল করে দাও।' আবার বলতে লাগল–'আজরাইল! আমার স্বামীরে তুই নিস না। নিতে হলে আমারেই নিবি। উনি যদি মরে যান, তাহলে আমি বাঁচব না। উনার মরণ আমি বেঁচে থাকতে সহ্য করতে পারব না।'

জেলের বউ সারাক্ষণ ঘরের কাজ-কর্ম করত, আর উক্ত কথাগুলো বলত। তাছাড়া জেলের কোনো আত্মীয় জেলেকে দেখতে এলেই সে শুরু করত–আজরাইল! আমারে নে, উনারে নিবি না। আমার বাঁচার দরকার নেই। উনি মরলে আমি বাঁচব না। আহারে...। এতে সবাই ভাবত–জেলের জন্য জেলের বউয়ের খুবই দরদ। একথা ভেবে সবাই শুধু আফসোস করত এবং সমবেদনা জানাত।

তখন ছিল বৈশাখ মাস। একদিন বিকেল বেলা ভীষণ ঝড় শুরু হলো। তা দেখে জেলের বউ নিজেই তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের গরু ও ষাড়টাকে মাঠ থেকে নিয়ে এলো। গোয়ালের কাছে নিয়ে পৌঁছতেই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। জেলের বউ তাড়াতাড়ি ষাড়টাকে না বেঁধে কোনো রকম গোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরে চলে এলো।

আস্তে আস্তে ঝড়ের বেগ বাড়তে লাগল। জেলের বউ কাজ সেরে জেলের কাছে এসে যখন বসেছে, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। জেলের কাছে বসেই স্ত্রী তার মুখস্ত করা সেসব কথা আবার আওড়াতে লাগল–ওরে আজরাইল ....।

এদিকে ঝড়ের বিকট আওয়াজে ষাড়টা ভীষণ ভয় পেয়ে লাফালাফি শুরু করে দিল। তখন গলায় দড়ি না থাকায় সেটা গোয়ালের বাইরে চলে এলো। কিন্তু বাইরে বৃষ্টিতে ভিজে ষাড়টা দিশেহারা হয়ে পড়ল। তখন বিজলীর আলোতে জেলের ঘরটা ষাড়ের নজরে এলো। তখন ষাড়টা দৌড়ে চাষীর ঘরের বারান্দায় উঠে এলো।

বারান্দায় এসে ষাড়টা কাঁপতে কাঁপতে পাশে সরতে লাগল। পাশেই ছিল একটি ডুলিতে ধানের কুড়া ও ভুষি। বিজলীর আলোতে ষাড় ডুলিটি দেখতে পেয়ে এই বিপদেও সে খাবারের আশায় ডুলির ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিল। কুড়া পেয়ে ষাড়টা ইচ্ছেমতো খেতে লাগল।

খেয়ে দেয়ে যখন ষাড়টা মাথা তুলতে যাচ্ছিল, তখন ষাড়ের বাঁকা শিংয়ে ডুলিটা আটকে গেল। তাই ষাড়টি মাথা তুলতেই ডুলির অবশিষ্ট কুড়া এসে ষাড়ের নাকে-চোখে পড়ল। তাতে ষাড় পড়ল মহাবিপদে। প্রচণ্ড অন্ধকার, মেঘের বিকট আওয়াজ, চোখেও কিছু দেখছে না, মাথায় বিশাল বোঝা। তখন ষাড়টা মাথা ঝাকাতে লাগল আর পথ খুঁজতে লাগল এবং এলোপাথাড়িভাবে তার বিশাল মাথাটা নাড়াতে লাগল।

ঘটনাক্রমে ষাড়টি এগিয়ে গিয়ে জেলের ঘরের সামনের দরজাটার কাছে এসে যখন তার বিশাল মাথাটা এগিয়ে দিল, তখন খোলা দরজা দিয়ে তার মাথাটা ঢুকে গেল। এমনি পথ পেয়ে ষাড়টা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। জেলের বউ তখনও বলে যাচ্ছিল–'আজরাইলরে উনারে তুই নিবি না, আমারে

নে...।' এমন সময় জেলের বউ দেখতে পেল–বিশাল মাথার এক আজব প্রাণী ঘরে ঢুকেছে। জেলে ও তার স্ত্রী এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেল।

তখন জেলের বউ ভাবল–কুচকুচে কালো বিশাল উঁচু আর বিরাট মাথাওয়ালা এই জীবটা নিশ্চয় আজরাঈল। আজ খাইছে। ও আল্লারে... বলেই জেলের বউ তিন হাত পিছিয়ে চিৎকার মেরে বলতে লাগল–ও আজরাইল! আমি না, আমি না, আমি না, আমি দিব্যি সুস্থ আছি। জেলেকে দেখিয়ে বলল–উনি অসুস্থ, উনারে নিয়ে যাও। উনি রোগে ভুগছেন, মরতেও চান। উনারে নেও....।

ষাড়টা মাথা থেকে ডুলিটা ফেলার জন্য মাথাটা এপাশ ওপাশ করে ঝাঁকাচ্ছিল আর এগুচ্ছিল। জেলের বউ দেখল–ওটা মাথা নাড়াচ্ছে আর এগুচ্ছে তার দিকে। সে ভাবল–আজরাইল বুঝি তাকেই নেবে। আর উপায় নেই। পালানোর পথও পাচ্ছে না। এভাবে ওটাকে আরও এগুতে দেখে জেলের বউ চিৎকার করতে করতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

শিক্ষা : *বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়।*

চাকরি পরীক্ষায়ও নকল!

সোহেল ও রাসেল দুই বন্ধু। সোহেল পড়াশোনায় ভাল। আর এর বিপরীত হল রাসেল। অর্থাৎ পড়ালেখায় বেজায় খারাপ। তারা দুই বন্ধুই ক্লাস ওয়ান থেকে একসাথে পড়ে ডিগ্রী পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল–রাসেল ক্লাস ওয়ান থেকেই সোহেলের পেপার দেখে দেখে লিখে পাশ করেছে। আজ তারা দুই বন্ধু এক জায়গায় চাকরির ইন্টারভিউ দেবে। রাসেল সোহেলকে বলল–তুই প্রশ্নের উত্তরগুলো একটু জোরে বলবি। আমি জানালার দিকে কান পেতে থাকব। কারণ আমার সব জ্ঞানই তো তোর সৌজন্যে।

ইন্টারভিউ শুরু হল। প্রশ্নকর্তা সোহেলকে জিজ্ঞাসা করলেন–বলুন তো বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হয়েছে?

সোহেল : সেই বায়ান্ন ইংরেজি থেকে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, আর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্নকর্তা : ভেরি গুড! আচ্ছা, এবার ১৯৭১ সালের শহীদ-এর মধ্য থেকে ৫/৬ জন শহীদের নাম বলুন।

সোহেল : স্যার! ১৯৭১ সালের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫/৬ জনের নাম বলে বাকিদের আমি খাটো করতে চাই না।

প্রশ্নকর্তা : গুড। আচ্ছা, এবার ভিন্ন ধরনের একটা প্রশ্ন করি–মহাকাশে প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে। বলুন তো এর সর্বশেষ রেজাল্ট কী?

সোহেল : এ সম্পর্কে স্যার এখনো গবেষণা চলছে। রেজাল্ট বের হলে আপনি ও আমি সবাই জানতে পারব।

প্রশ্নকর্তা : ভেরি গুড। এবার আসতে পারেন। পরে ফলাফল জানানো হবে।

রাসেল জানালার ফাঁক দিয়ে শুধু উত্তরগুলো শুনেছিল। কারণ প্রশ্নকর্তা আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেছিলেন বিধায় রাসেল প্রশ্ন শুনতে পায়নি। তাই সে মনে মনে উত্তরগুলো মুখস্ত করে নির্ভয়ে ইন্টারভিউ রুমে প্রবেশ করল।

প্রশ্নকর্তা রাসেলকে জিজ্ঞাসা করলেন–আচ্ছা বলুন তো আপনার জন্ম কত তারিখে হয়েছিল?

রাসেল : সেই ১৯৫২ সাল থেকে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং ৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রশ্নকর্তা ভাবলেন–হয়তো অন্য মনস্ক থাকায় প্রশ্ন বুঝেনি। তাই অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে বললেন–আপনার বাবার নাম কী?

রাসেল : স্যার! লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্য থেকে ৫/৬ জনের নাম বলে বাকিদের আমি খাটো করতে চাই না।

প্রশ্নকর্তা আশ্চর্য হয়ে বললেন–আপনি পাগল নাকি?

রাসেল : এই সম্পর্কে স্যার এখনো গবেষণা চলছে। রেজাল্ট বের হলে আপনি ও আমি সবাই জানতে পারব।

এসব উত্তর শুনে প্রশ্নকর্তা একেবারে 'থ' বনে গেলেন।

শিক্ষা : *যে সারাজীবন নকল করে পাশ করেছে তার কপালে চাকরি নেই।*

ষাড়ের সাথে পাল্লা!

এক কৃষকের একটি ষাড় ছিল। ষাড়টার একটা ভাল গুণ ছিল। সে অন্যায়ভাবে অন্যের ফসল খেত না। সে জন্যই কৃষক তাকে বেঁধে না রেখে নির্ভয়ে মাঠে ছেড়ে দিত।

ষাড়টা একদিন ঘাসের খোঁজ করতে করতে নিজ গ্রামের মাঠ ছেড়ে দূরে চলে গেল। সেখানে সে একটি বন দেখতে পেল। বনে ঢুকে মজা করে ঘাস পাতা খেল। তারপর থেকে ষাড়টি প্রতিদিন ঐ বনে যেত এবং সেখানকার তাজা ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে বেশ মোটা-তাজা হয়ে উঠল।

তার পাশের বাড়িতে একটা ছাগল থাকত। সে ছিল ভীষণ অহংকারী। একদিন ছাগলটা ষাড়কে ডেকে বলল–ষাড় ভাইয়া! তুমি প্রতিদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কোথায় যাও? আমাকে নিয়ে যেতে হবে সেখানে। ষাড় বলল–আমি যেখানে যাই, সেখানে তো অনেক হিংস্র পশু বাস করে। তাই তোমার মতো ছোট প্রাণীকে দেখতে পেলে তারা তোমার ক্ষতি করতে পারে। ছাগলটা তখন বেশ রেগে গিয়ে বলল– তুমিও প্রাণী আমিও প্রাণী। তুমি যা খেয়ে জীবন ধারণ কর, আমিও তা-ই খাই। সুতরাং তুমি সেখানে যেতে পারবে, আমি সেখানে যেতে পারব না কেন?

এসব প্রশ্নের জবাবে ষাড়টা আর কিছুই বলতে পারল না। তাই ছাগলটাকে সাথে নিয়েই সে বনের দিকে রওয়ানা হল। বনে পৌঁছে ছাগল ষাড়ের সাথে থেকে ঘাস খেয়ে সেদিনের মতো বাড়ি ফিরল। বাড়িতে ফিরে ছাগলের আনন্দ আর ধরে না। সে ভাবল–আমি তো বনে যাওয়ার রাস্তা জেনেই গেছি। এখন বনে যাওয়ার জন্য আর ষাড়ের প্রয়োজন কী? সে আরো ভাবল–ষাড়তো এতদিন একাই বনে যেত। আমি পারব না কেন? কথাগুলো ভাবার পর সে একা একা বনে চলে গেল। তাও আবার একেবারে বনের মাঝখানে।

বনে শিয়ালের দল আড্ডা দিচ্ছিল। তারা বনে ছাগল দেখতে পেয়ে খুব খুশি হল, আবার অবাকও হল। এরপর শিয়ালগুলো ছাগলকে তাড়া করল।

ছাগল কিন্তু বসে নেই। সেও প্রাণপণে ছুটল। আর মনে মনে তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হল এবং স্বীয় কৃতকার্যের প্রতি আফসোস করতে লাগল। কিন্তু তখন আফসোস করে কোনো লাভ হল না। শিয়ালগুলো তাকে ধরে ঘাড় মটকে মজা করে খেয়ে ফেলল।

শিক্ষা : *অহংকার করা ভাল নয়। অহংকার পতনের মূল।*

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়

এক কাঠুরিয়া প্রতিদিন বন থেকে কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করত এবং যা কিছু আয় হত তা দিয়েই তার কষ্টের সংসার কোনো রকমে কেটে যাচ্ছিল। একদিন কাঠুরিয়া তার প্রতিদিনের নিয়ম অনুযায়ী বনে কাঠ কাটতে গেল এবং তার কুড়াল দিয়ে একটি বৃক্ষের ডাল কাটতে শুরু করল। হঠাৎ ঐ বৃক্ষটির কাছে এক দরবেশ হাজির হল। দরবেশ বললেন, তুমি গাছ না কেটে ঐ গাছের গোড়ার পূর্ব দিকে দেখ একটি গুহা আছে, ঐ গুহার ভেতরে একটি ঢেঁকি আছে। ঐ ঢেঁকিটি নিয়ে যাও। যখন তোমার খাওয়ার প্রয়োজন হবে, তখন আল্লাহর কাছে চাইবে–'হে আল্লাহ! এ ঢেঁকির মাধ্যমে চাউল দাও।' তাহলে দেখবে ঢেঁকি থেকে চাউল বের হবে। তা দিয়ে তোমার সকল প্রয়োজন মিটে যাবে।

কাঠুরিয়া দরবেশের কথা শুনে বৃক্ষের গোড়ার পূর্ব দিকে গিয়ে সত্যিই একটি গুহা দেখতে পেল এবং গুহার ভেতরে একটি ঢেঁকিও পেয়ে গেল। সে ঢেঁকিটি নিয়ে বাড়িতে গেল। যখন সে বাড়িতে পৌঁছল, তখন তার বউ ঢেঁকি দেখে তো রেগেই আগুন। সে আজ কিনা কাঠের বদলে ঢেঁকি এনেছে। তখন কাঠুরিয়া তার স্ত্রীকে সব কথা খুলে বলল। তার স্ত্রী বলল–ঠিক আছে, তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যাক। তাই ঢেঁকির কাছে তার

স্ত্রী বলল, 'হে আল্লাহ! আমাদের যে খাওয়ার কিছু নেই। আমরা এখন কী খাব? এ ঢেঁকির মাধ্যমে খাবারের ব্যবস্থা কর।' তখন সত্যি সত্যি ঢেঁকি থেকে চাউল বের হতে লাগল, তা কি আবার যেমন তেমন চাউল? একেবারে আতপ চাউল। তখন কাঠুরিয়া আর তার বউ দু'জনেই খুশিতে বাগবাগ। এভাবেই তাদের সুখের সংসার চলতে লাগল।

কিন্তু কথায় বলে–'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়।' এদের ঠিক তাই হল। একদিন কাঠুরিয়ার স্ত্রী বায়না ধরল যে, এত সাধারণ ঢেকি থেকে এমন হয় তা ভাল দেখায় না। তাই তুমি এটি স্বর্ণকারের বাড়িতে নিয়ে যাও এবং এ ঢেঁকিটিকে স্বর্ণের রঙে রঙিন করে আনো। কাঠুরিয়া তার স্ত্রীর কথায় অমত করলো না। সে ঢেঁকিটি নিয়ে স্বর্ণকারের বাড়িতে গেল এবং বলল–ভাই! আমার ঢেঁকিটিতে স্বর্ণের রঙ দিয়ে দাও। কিন্তু খবরদার! এমন কথা যেন বলোনা যে, 'হে আল্লাহ! ঢেঁকির মাধ্যমে আমাদেরকে চাউল দাও।' স্বর্ণকার বলল, ঠিক আছে।

কাঠুরিয়া যখন বাড়িতে চলে গেল, তখন স্বর্ণকার ভাবল–একবার বলেই দেখিতো কী হয়। তাই সে যেই না তা বলল, অমনি ঢেঁকি থেকে চাউল বের হতে লাগল। স্বর্ণকার বুঝল–এ তো সাধারণ ঢেঁকি নয়, এ ঢেঁকি কাঠুরিয়াকে দেওয়া যায় না। তাই সে ঐ ঢেঁকিটি লুকিয়ে রাখল এবং ঐ রকমই একটি ঢেঁকিতে স্বর্ণের রঙ করে কাঠুরিয়াকে দিয়ে দিল।

কাঠুরিয়া নকল ঢেঁকি নিয়ে বাড়িতে চলে গেল। কিন্তু যখন তারা বলল, 'হে আল্লাহ! চাউল দাও' তখন কোনো চাউল বের হলো না। এ দেখে তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। একদিন উপোস থেকে কাঠুরিয়া আবার কাঠ কাটতে বের হল। কাঠুরিয়া ঐ বৃক্ষের কাছে যেতেই আবার দরবেশ হাজির হয়ে বললেন, তুমি আবার কাঠ কাটতে এসেছ কেন? কাঠুরিয়া সকল কথা দরবেশকে খুলে বলল। দরবেশ বললেন–ঠিক আছে, এবার ঐ গুহায় যাও একটি পাতিল পাবে। ঐ পাতিলের উসিলায় ভাত-তরকারী সব পাবে। এবার কাঠুরিয়া পূর্বের ঐ গুহায় গিয়ে পাতিলটি নিয়ে বাড়িতে চলল।

বাড়িতে সে তার স্ত্রীকে পাতিলের কথা বললে কাঠুরিয়ার স্ত্রী খুশিতে আটখানা। তখনই সে বলল, 'হে আল্লাহ! পাতিল থেকে আমাদেরকে খাবার দাও।' অমনি পাতিল থেকে কোর্মা, পোলাও, বিরিয়ানী আরও কত উন্নতমানের খাবর বের হতে লাগল, যা তারা জীবনেও চোখে দেখেনি। এভাবে কিছুদিন তাদের বেশ আনন্দেই চলল।

একদিন কাঠুরিয়ার বউ আবার পূর্বের মতো বায়না ধরল যে, ওগো! এই পাতিলটি একটু স্বর্ণের রঙ করে নিয়ে এসো না। এতো সাধারণ পাতিলের এতো গুণ–তা ভাল লাগে না। কাঠুরিয়া তার বউয়ের কথায় রাজি হয়ে গেল এবং পাতিলটি স্বর্ণকারের বাড়িতে নিয়ে গেল। এবারও স্বর্ণকার পাতিলটির গুণ দেখে তার পরিবর্তে একটি নকল পাতিল কাঠুরিয়াকে দিল। কাঠুরিয়া বাড়িতে ফিরে তো মাথায় হাত দিল। তারপর আবার কাঠ কাটতে বের হল।

আবার সেই দরবেশের সাথে দেখা হল। দরবেশ বললেন–তুমি আবার কাঠ কাটতে এসেছ কেন? কাঠুরিয়া পূর্বের সকল কথা দরবেশের কাছে খুলে বলল। দরবেশ বললেন–ঐ গুহার কাছে আবার যাও এবং সেখানে একটি লাঠি পাবে। সেই লাঠিকে বলবে–'উঠ লাঠি, পিটাও।' কাঠুরিয়া দরবেশের কথা শুনে আবার ঐ গুহার কাছে চলে গেল এবং গুহায় একটি লাঠি পেলো। লাঠিটি নিয়ে খুশিতে বাড়িতে চলে গেল। যখন বলল–'উঠ লাঠি পিটাও' আর যায় কোথায়, লাঠি কাঠুরিয়া এবং তার বউ দু'জনকেই পিটুনি শুরু করে দিল। সেই লাঠি আর থামে না। তখন দু'জনেই খুব অনুনয় বিনয় করা শুরু করল এবং বলল–ভাই লাঠি! আল্লাহর দোহাই, আর আমাদেরকে মেরো না। আমাদের কোনো দোষ নেই। তখন লাঠি থেমে গেল।

এবার কাঠুরিয়া চালাকি করে ঐ লাঠিকে স্বর্ণকারের বাড়িতে নিয়ে গেল এবং বলল–স্বর্ণকার ভাই! এটিকে একটু সোনার রঙ করে দাও। কিন্তু সাবধান, আবার যেন বলনা যে, 'উঠ লাঠি, পিটাও।' এই বলে কাঠুরিয়া বাড়িতে চলে গেল।

এদিকে স্বর্ণকার যখনই বলল–'উঠ লাঠি, পিটাও।' তখনই লাঠি পিটুনি শুরু করে দিল। সেকি এই সেই পিটুনি, একেবারে হাড়ভাঙ্গা পিটুনি। স্বর্ণকারের চিল্লা-চিল্লি শুনে তার বউ ও ছেলে-মেয়ে সবাই ছুটে এলো। তখন সবার একই দশা হলো। তারা কাঠুরিয়াকে ডেকে আনল এবং বলল–ভাই! আমরা তোমার সবকিছু ফিরিয়ে দিচ্ছি, তুমি লাঠি থামাও। তখন কাঠুরিয়া 'থাম' বলতেই লাঠি থেমে গেল। তখন স্বর্ণকার কাঠুরিয়ার ঢেঁকি, পাতিল সবকিছুই কাঠুরিয়াকে ফিরিয়ে দিলো। দুষ্ট স্বর্ণকার উচিত সাজা পেল এবং গরীব কাঠুরিয়া আবার পূর্বের মতো সুখে সংসার করতে লাগল।

শিক্ষা : *দেরিতে হলেও অপরাধের শাস্তি একদিন পেতেই হয়।*

ঠকবাজের দল

এক ঠকবাজ তার সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে এক গ্রামে প্রবেশ করল। তারা এক দোকানদারের কাছে গিয়ে বাকিতে চাল, ডাল, নুন, তেল কিনে নিজেরা রান্না করে খেল। পরে দোকানদার টাকা চাইতে এলে তারা দোকানদারকে বলল–আমাদের কাছে ১০০০ টাকার নোট আছে। না ভাঙালে টাকা দেব কোত্থেকে? টাকা পরে নিও। উল্টো তারা মাছ-তরকারী কেনার জন্যও মুদীর কাছ থেকে আরো কিছু টাকা ধার নিল। মুদী এত বড় খদ্দের পেয়ে মনে মনে খুশি হল। কারণ একে তো গ্রামের দোকান, তার উপর আবার এক কিনারে। ভাল বেচা-কেনা হয় না। যখন বহু দিন পর ভালো খদ্দের পাওয়া গেছে বাকি হলেও ভাল। আর বাকির কারণে ষোল আনার স্থলে সতের আনা তো নেবেই।

চার-পাঁচ দিন এভাবে বাকিতে নিল। এদিকে দোকানীরও টাকার দরকার হয়ে পড়ল। তাই সে আরেক দিন এসে বলল–ভাই! নোটটা ভাঙিয়েছেন কি? যদি না ভাঙিয়ে থাকেন, তাহলে আমার কাছে দিন, আমি মহাজনের ঘর থেকে ভাঙিয়ে এনে দেব। ঠকবাজ আর তার সাথী বলল–

তোমার আর মহাজনের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। বিকালে আমরাই ভাঙিয়ে এনে তোমাকে টাকা দিয়ে বিদায় হব।

যথাসময়ে তারা দোকানে গেল। তখন মুদী টাকা চাইল। ঠকবাজ তার ব্যাগ বের করে হিসাব চাইতেই মুদী বলল–আপনাদের কাছে আমার পাওনা হয়েছে ২২৫ টাকা। ঠকবাজ যখন মানি ব্যাগ বের করে টাকা দিতে চাইলো, তখন তার সাথী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল–আপনি কেন এ টাকা দিতে যাচ্ছেন? এ টাকা আমি দেব। বলেই সে নিজের মানি ব্যাগ বের করবে আর তখনি ঠকবাজ তাকে বাধা দিল। এভাবে দু'জনের বাদানুবাদ শুরু হল। এ বলে আমি দেব ও বলে আমি দেব।

কোন মীমাংসায় না পৌঁছতে পেরে অবশেষে তারা মুদীকে বলল–দেখ, আমরা তোমার চোখ বেঁধে দেব। তুমি যাকে ছোঁবে, সে-ই টাকা দেবে। মুদী দেখল বড় মজার ব্যাপার। সে অগত্যা তাতেই রাজি হল। মুদীর চোখ বাঁধা হলে ঠকবাজ ও তার সাথী নিজ নিজ পুঁটলী নিয়ে পালিয়ে গেল। মুদী দোকানী তাদেরকে হাতড়ে বেড়াতে লাগল। বহুক্ষণ পর মুদীর দোকানে অন্য খদ্দের এলো। মুদী তাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল–এবার আমার টাকা দিন। লোকটা বিস্ময়ে চেচিয়ে উঠতেই মুদী চোখ খুলে দেখল–তারা নেই। তখন সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর তার স্মরণ হল–বিপদে এভাবে ভেঙে পড়লে হয় না। এর বিহিত করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে সে থানায় অভিযোগ করল। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন পুলিশ ঠকবাজদের তালাশে বের হল। খুঁজতে খুঁজতে তাদেরকে লঞ্চ ঘাটে পেল। আর একটু দেরি হলেই তারা লঞ্চে উঠে নিরুদ্দেশ হত। পুলিশরা তাদেরকে পাকড়াও করে এনে দোকানীর টাকা পরিশোধসহ প্রতারণার জন্য উচিত শিক্ষা হিসেবে খুব উত্তম মধ্যম দিল। আর দোকানীকে সাবধান করে দিল–যাকে তাকে বাকি না দিতে।

শিক্ষা : *নাম পরিচয় না নিয়ে যার তার সাথে লেনদেন করা উচিত নয়।*

পরের ধনে পোদ্দারী

এক ব্যক্তির ছেলের বিয়ে। বরের জন্য ছেলের বাবা পাড়া থেকে এক ব্যক্তির শেরওয়ানীটি চেয়ে নিল। বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রীদের সঙ্গে শেরওয়ানীর মালিকও উপস্থিত হলো। নিয়ম মাফিক সবাই জামাই দেখতে আসলো। একজন জিজ্ঞাসা করলো বর কোনটা? শেরওয়ানীর মালিক বললো–'এই যে ইনি হলেন বর, তবে শেরওয়ানীটি আমার।' ছেলের বাবা লোকটির কাছে এসে বললো, এই মিয়া! তুমি বড় অনর্থক লোক দেখছি। একথা বলার কী দরকার ছিল যে 'শেরওয়ানীটি আমার?'

'লোকটি বললো, সত্যি, ভুল হয়ে গেছে। এখন থেকে সতর্ক থাকবো।' এমন সময় আরেকটি লোক এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'বর কোনটি?' শেরওয়ানীর মালিক বললো, 'বর উনি, তবে শেরওয়ানীটি আমার নয়।' ছেলের বাবা বিরক্ত হয়ে আবার লোকটির কাছে এসে বললো, 'তুমি আশ্চর্য লোক দেখছি। একথা বলারই বা কী দরকার ছিল যে, শেরওয়ানীটি আমার নয়।' শেরওয়ানীর ব্যাপারে কোনো কথাই উঠবে না।' লোকটি বললো, সত্যিই একথা বলার কোনো দরকার ছিল না। এখন থেকে একথাটিও বলবো না।

এমন সময় আবার একজন এসে জিজ্ঞাসা করলো, 'বর কোনটি?' শেরওয়ানীর মালিক এবার বললো, 'বর উনি, তবে শেরওয়ানীর ব্যাপারে কোনো কথা উঠবে না। অগত্যা ছেলের বাবা বরের গা থেকে শেরওয়ানীটি খুলে লোকটিকে ফেরত দিয়ে বলল, তোমাকে বুঝানো সম্ভব নয়।

শিক্ষা : *বুদ্ধি যাদের নেই, তাদেরকে শত চেষ্টা করেও বুঝানো যায় না। আর পরের ধনে পোদ্দারী করারও প্রয়োজন নেই।*

ভণ্ডপীরের পরিনতি

এক ভণ্ডপীরের দুই শিষ্য ছিল। তারা পীরের ভণ্ডামী প্রত্যক্ষ করে উপরে উপরে পীরের সেবা করলেও মন থেকে পীরকে ঘৃণা করতো। বাড়তি টাকা পাওয়া যায় বলে পীরের দরবারে থাকতো। পীর জোর করে তাদের দিয়ে পা টিপাতো এবং তেল মালিশ করাতো। তাদের একজনের কাজ ছিল পীরের ডান পায়ে তেল মালিশ করা। অপরজনের কাজ ছিল পীরের বাম পায়ে তেল মালিশ করা।

একদিন শিষ্যদের একজন কোনো কাজে অন্য গ্রামে গেল। বাম পায়ের সেবক বসে গেল। পীর বলল, ওরে! ওতো কাজে গেল, তুই দু'টি পা-ই ধুয়ে তেল মালিশ করে দে।

শিষ্য তো পীরের কথা শুনে রেগে টং। বলল–কেন, আমি ওর পায়ের যত্ন করতে যাব কেন? আমি পারব না। পীর বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনো রকমে তাকে রাজি করাল। কিন্তু বেয়াদব শিষ্যটি রেগে পীরের ডান পা এমনভাবে নাড়া-চাড়া করল যে, শেষ পর্যন্ত পা-টি মচকে গেল। পীরের আর্তনাদ শুনে অন্য শিষ্যরা ছুটে এলো। সবশুনে তারা শিষ্যটিকে আচ্ছা রকম উত্তম মধ্যম দিতে গেল। শেষে পীর-ই ওদের বুঝিয়ে থামাল।

পরদিন গ্রাম থেকে সেই শিষ্যটি ফিরে এসে শুনল সব ঘটনা। শুনে সে চিৎকার করে বলল, কী? আমার খেদমত করার পা-টা অমন করে মচকে দিল? ঠিক আছে আমিও দেখে নিচ্ছি। এই বলে সে ছুটে এসে অপর সাথীর খেদমতের পীরের বাম পা ধরে বেদম জোরে চাপ দিতে লাগল। আর সেই চাপ সইতে না পেরে বাম পা-টিও মচকে গেল। যন্ত্রণায় পীর আর্তনাদ করতে লাগল।

শব্দ শুনে অন্য শিষ্যরা ছুটে এলো। সব শুনে শিষ্যকে গালমন্দ শুরু করল। এবার পীর শিক্ষা পেয়ে কাউকেই আর খেদমতে রাখল না।

শিক্ষা : *ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামী করতে গেলে পরিণতি এমনই হয়।*

ভুল বুঝলো

একবার ঘূর্ণিঝড় এক কর্মকারের ছেলেকে উড়িয়ে নিয়ে এক রাজার বাড়ির আঙ্গিনায় ফেলল। তাকে দেখে সকল লোকজন অত্যন্ত বিস্মিত হল এবং সকলেই বলাবলি করতে লাগল যে, এ ছেলেটি কোথা থেকে এসেছে? এ ছেলে আমাদের অতিথি হিসেবে আমাদের নিকট দূত। সুতরাং তাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা উচিত। এ কথা শুনে রাজা তার মনের আকুতি ব্যক্ত করে বললেন যে, আমার কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে। তার জন্য অনেক জায়গা থেকে বর আসে, কিন্তু আমি কোথাও কোনো পাত্র নির্বাচন করিনি। এখন আমার ইচ্ছা হল–এই মহান অতিথি দূতের সাথে আমার প্রিয় দুলালীর বিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা বিবাহের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ফেল।

রাজার এ অভিমত সবাই সানন্দে গ্রহণ করল। অতঃপর পাত্রকে যথা সময়ে গোসল করানোর জন্য নেওয়া হল। হঠাৎ সে কাঁদতে শুরু করল। যখন গোসলের জন্য শরীরে গরম পানি ঢালা হল, তখন সে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি কাঁদতে লাগল। এরপর পাত্রকে পরিণয়ের সাজে সজ্জিত করে রাজদরবারে উপস্থিত করা হল। রাজার সামনে উপস্থিত করার সাথে সাথে ছেলেটি কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং বলতে লাগল–আমাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? কেনই বা আমার সাথে এমন আচরণ করছেন? শত চেষ্টা করেও তার কান্না থামানো গেল না।

অতঃপর কাজীর নির্দেশক্রমে রাজার আদরের দুলালীকে পাত্রের সামনে উপস্থিত করা হল। তাদের ধারণা ছিল–হয়তোবা ছেলেটি রাজার সুদর্শনা ও সুশ্রী কন্যাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে কান্না বন্ধ করে দেবে। কিন্তু না, তাতেও ফল উল্টো হল। সে শাহজাদীকে দেখে আরো ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে পূর্বের চেয়ে আরো উচ্চ আওয়াজে কাঁদতে শুরু করল।

তার এ অবস্থা দেখে রাজা মনে করলেন, ভিন্ন জায়গা থেকে এখানে আসায় তার আতঙ্ক ভাব রয়ে গেছে। কাজেই এটাই সবচেয়ে উত্তম হবে যে, এ ছেলেকে কিছুদিনের জন্য খোলামেলা পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে হবে।

রাজা তা-ই নির্দেশ দিলেন। তাকে ছেড়ে দেওয়া হল।

সে ছাড়া পেয়ে সরাসরি নিজের বাড়িতে চলে গিয়ে মাতা-পিতার নিকট কেঁদে কেঁদে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে লাগলো। বলল–আমি ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে রাজার বাড়িতে পড়ার পর লোকজন আমাকে ধরে নিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মারার জন্য অগ্রসর হল। লোকেরা আমার উপর গরম পানি ঢালা শুরু করল, যাতে আমি অতিশীঘ্রই মরে যাই। সবশেষে আমার সামনে এক সুন্দর সুশ্রী যাদুকারিণীকে আনল, যেন সে আমাকে খেয়ে ফেলে।

শিক্ষা : *যথাযথ জ্ঞান না থাকলে মানুষ ভুল বুঝে থাকে।*

মুরগীর মাথা কোথায়

বৃটিশ আমলে এক ইংরেজের রান্না-বান্না করার জন্য এক বাঙ্গালী বাবুর্চি ছিল। সে প্রতিদিন তার মালিককে একটি আস্ত মুরগী রান্না করে দিত। ইংরেজ আস্ত মুরগীটি একা একা খেয়ে ফেলতো। বাবুর্চির জন্য সে একটুও রাখতো না। একদিন বাবুর্চি মনে মনে চিন্তা করল–আজ আমি মুরগীর একটা রান খেয়ে ফেলব।

সত্য সত্যই সে মুরগীর একটা রান খেয়ে বাকিটুকু তার মালিকের সামনে দিল। যখন ইংরেজ লোকটি খেতে বসল, দেখল মুরগীর রান একটা। তখন বাবুর্চিকে ডেকে বলল, আরেকটা রান কোথায়? বাবুর্চি বলল, স্যার! কোনো কোনো মুরগীর রান একটাই থাকে। ইংরেজ তার কথা বিশ্বাস করল না।

কিছুদিন পর বৃষ্টি থামার পরে একটি মুরগী একটি পা উপরে তুলে রোদ পোহাচ্ছিল। তখন বাবুর্চি তার মনিবকে ডেকে বলল, স্যার! দেখুন–এই যে মুরগীটার একটি রান। তা দেখে ইংরেজ লোকটি বিশ্বাস করল। এরপর থেকে বাবুর্চি মাঝে মাঝেই একটা করে রান খেয়ে অপরটি তার মনিবকে দেয়।

এর কিছুদিন পর বাঙ্গালি বাবুর্চি মুরগীর উভয় রান খেয়ে ফেলল। তার মনিব তাকে বলল–এবার দেখি কোনো রানই নেই? মুরগীর রান গেল

কোথায়? বাবুর্চি জবাব দিল, স্যার! কোনো কোনো মুরগীর রান একটিও থাকে না। ইংরেজ লোকটি এটা বিশ্বাস করল না।

অতঃপর একদিন বৃষ্টির পর মুরগী তার বাচ্চাদের হেফাজতে উভয় রান গুছিয়ে নিয়ে তার পাখা দ্বারা বাচ্চাদের ঢেকে ঘুমাচ্ছিল। বাবুর্চি তখন তার মনিবকে ডেকে বলল, স্যার! দেখুন–মুরগীর একটিও রান নেই। ইংরেজ লোকটি এটা দেখে বিশ্বাস করল।

এরপর বাবুর্চি একদিন মুরগীর মাথাও খেয়ে ফেলল। তার মনিব তাকে বলল– ব্যাপার কি! মুরগীর মাথা কোথায়? তখন বাবুর্চি বলল, স্যার! কোনো কোনো মুরগীর মাথাও থাকে না। এবার ইংরেজ লোকটি এটা কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে চাইল না।

সে দিনই বৃষ্টির পরে একটি মুরগী পাখার ভেতরে মাথা নিয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। এই মুহূর্তে বাবুর্চি তার মনিবকে ডেকে নিয়ে বলল, এই যে দেখুন–এই মুরগীটার মাথাও নেই। ইংরেজ লোকটি এটা দেখে বিশ্বাস করতে বাধ্য হল। তখন থেকে লোভী বাবুর্চি মাঝে মাঝে মুরগীর রান, আবার কখনও মাথা খেয়ে ফেলে।

এরপর এক সময় বোকা ইংরেজ লোকটি চালাক হয়ে উঠে আর বাবুর্চির চালাকি ধরে ফেলে। তখন বাবুর্চি বলে, প্রথমেই যদি আমাকে মুরগীর গোশতের সামান্য ২/১টি টুকরা দিতেন, তাহলে তো আমি আর এমন ফন্দি করতাম না।

ইংরেজ তার ভুল বুঝতে পারে। এরপর থেকে বাবুর্চি মনিবের সামনে সবটুকু গোশত দিলেও ইংরেজ লোকটি বাবুর্চির জন্য কিছু রেখে দিতে থাকে। এভাবে তাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে।

শিক্ষা : *সবার প্রাপ্য অধিকার সঠিকভাবে পেলে কেউ কাউকে ঠকানোর চেষ্টা করতো না।*

মরেও জ্বালাচ্ছে

এক গ্রামে বাস করত 'ইবনুল মুয়াদ্দাব' নামে এক ব্যক্তি। কিন্তু লোক সমাজে 'কালার বাপ' নামে তার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। সে ছিল অতিশয় চালাক, বাটপার ও মিথ্যাচারী। যার দরুণ গায়ের সব লোক তাকে ঘৃণার চোখে দেখতো। কেউ তাকে ইজ্জত-সম্মান করতো না। কারণ গ্রামের প্রায় প্রতিটি লোক থেকে সে ঋণ নিয়েছে। কিন্তু দেবে দেবে করে কারো ঋণ পরিশোধ করেনি। ফলে সবাই তার উপর ক্ষেপে গেছে। তাই লোক সমাজে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল–'কালার বাপ থেকে সাবধান।'

কালার বাপ যখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো, তখন গ্রামবাসীকে সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করল, হে গ্রামবাসী! আমি সারাটি জীবন আপনাদেরকে কষ্ট দিয়েছি; নিপীড়নে ও অসদাচরণেই ছিলাম আমি ব্যস্ত। তাই আমার প্রতি এখন আপনারা সবাই ক্ষিপ্ত। আমি আপনাদের একটা কথা ওসীয়ত হিসেবে বলতে চাই, আমি যখন মারা যাব, তখন আপনারা আপনাদের সারাজীবনের দুঃখ-যাতনার বদলা হিসেবে আমাকে মাটি না দিয়ে চৌরাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে বাঁশের উপর ঝুলন্ত অবস্থায় রাখবেন, যেন লোকেরা আমাকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, মানুষকে ঠকালে এই শাস্তি হয়। এসব কথা বলে সে মারা গেল।

গ্রামবাসী তার ওসীয়ত অনুযায়ী তাকে চৌরাস্তায় বাঁশের উপর দাঁড় করিয়ে রাখল। ইতোমধ্যে একটি পুলিশগাড়ি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ পুলিশ সুপারের দৃষ্টি এ ঝুলন্ত লাশের উপর পতিত হলো। তখন লাশটিকে কোনো হত্যাকাণ্ড মনে করে তদন্ত করার জন্য মর্গে প্রেরণ করল।

পুলিশদের সন্দেহ গ্রামবাসীর উপর পড়ল। তাই পুলিশরা গ্রামবাসীকে পাইকারী হারে ধর-পাকড় করে বন্দীশালায় আবদ্ধ করল। যখন তাদেরকে কোর্টে হাজির করে হাকিম তাদের জবানবন্দী নিল, তখন তারা সকলেই প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করল। সবশুনে হাকিম তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু

এরই মধ্যে পুলিশকে দিতে হয়েছে অনেক টাকা। আর উকিল তো অগণিত টাকা নিয়েছেই। পাশাপাশি অসহায় গ্রামবাসীকে নির্যাতন তো সহ্য করতেই হলো। তাই হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে এসে গ্রামবাসী বলতে লাগল, কালার বাপ মরেও আমাদেরকে শান্তি দিল না। বেঁচে থাকতে যেমন জ্বালিয়েছে, মরেও তেমন জ্বালাচ্ছে।

শিক্ষা : *দুষ্ট লোকদের মিষ্টি কথা কখনো শুনতে নেই।*

বুদ্ধির ঢেঁকি

এক জমিদারের একটা চাকর ছিল। চাকরটি সব কাজেই ভুল করত। বার বার ধমকানোর পরও তার কোনো পরিবর্তন হলো না। অবশেষে সে একদিন বলল, স্যার! আমার আসলে কাজের কথা মনে থাকে না।

চাকর লেখাপড়া জানতো। তাই মালিক এরপর থেকে একটি তালিকা লিখে চাকরকে দিয়ে বলতো–এই সকল কাজ করবি। চাকর তাই করতো।

একদিন মালিক লিখল, আমি ঘোড়ায় চড়ে সফরে বের হব। তখন তোমাকে ঘোড়ার সঙ্গে যেতে হবে।

মালিক ঘোড়ায় চড়ে সফরে রওয়ানা হলেন। চাকরটিও সঙ্গে সঙ্গে চলল। হঠাৎ মালিকের মূল্যবান চাদরটি পড়ে গেল। চাকর তার কাজের তালিকাটি বের করে দেখল, সেখানে কোথাও এ কথা লেখা নেই যে, যদি ঘোড়া থেকে কোন জিনিস পড়ে যায়, তবে তা উঠিয়ে নিতে হবে। তাই চাদরটি সে ওঠালো না।

যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে মালিক দেখলেন–চাদর নেই, তখন চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন–আমার চাদর দেখছি না, কি ব্যাপার? চাকর বলল, স্যার! চাদরটি অমুক জায়গায় ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। মালিক তাকে ধমক দিয়ে বললেন–চাদর কেন ওঠাওনি? চাকর কাজের তালিকাটি বের করে মালিকের সামনে দিয়ে বলল, এখানে কোথাও এ কথা লেখা নেই যে, যা কিছু ঘোড়া

থেকে পড়বে, তা কুড়িয়ে নিতে হবে। তাই আমি ওঠাইনি। মালিক তখন তালিকাটি নিয়ে একথা লিখে দিলেন–যদি ঘোড়া থেকে কিছু পড়ে যায়, তবে তা উঠিয়ে নিতে হবে।

আরেক দিন মালিক ঘোড়ায় আরোহণ করে যাচ্ছেন। চাকরও পেছনে চলছে। সফর শেষ হওয়ার পর চাকর একটা বিরাট পোটলা মালিকের সামনে এনে হাজির করল। মালিক জিজ্ঞাসা করল, কী আছে এতে? চাকর কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল। মালিক পোটলা খুলে হতবাক হলেন। পোটলা ভর্তি ঘোড়ার লেদা। জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কেন? চাকর তালিকাটি মালিকের সামনে খুলে ধরল এবং বলল–দেখুন, এতে লেখা আছে–ঘোড়া থেকে যা কিছু পড়ে তা কুড়িয়ে নিও। আমি তো আপনার হুকুম মতো কাজ করেছি।

শিক্ষা : *অযোগ্য লোককে কোনো কাজে নিয়োগ দিতে নেই।*

মানুষের সন্ধানে

জঙ্গলের রাজা বাঘ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন সে তার একমাত্র বাচ্চাটিকে বলল, 'বাবা! মিলে মিশে থেকো। সবার সাথে সাক্ষাৎ করো, সবার কাছে যেও। কিন্তু মানুষ জাতের কাছে যেও না। এই বস্তুটা বড় অত্যাচারী ও জালিম। যদি কোনো সময় তার কাছে যাও, তাহলে মস্ত বড় ভুল হবে, বিপদে পড়ে যাবে।' এই উপদেশ প্রদানের পর জঙ্গলের রাজা বাঘ মারা গেল। তার মৃত্যুর পর বাচ্চা তার স্থলাভিষিক্ত হলো। জঙ্গলের রাজা হলো সে।

বাঘের বাচ্চার অভিজ্ঞতা ছিল না। সে ভাবলো–আমার বাপ বলেছিল মানুষের কাছে যেও না, এই জিনিসটা বড়ই জালিম। সুতরাং দেখা দরকার–মানুষ জিনিসটা কী রকম। আমার বাপ জঙ্গলের রাজা হওয়া সত্ত্বেও এই জিনিসটাকে ভয় পেতেন। তার এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই

বস্তুটিকে ভয় পাওয়ার কারণ কী? মনে হয় মানুষ খুব শক্তিশালী। বাঘ তো দুই গজ লম্বা হয়ে থাকে, আর মানুষ মনে হয় দশ বিশ গজ লম্বা হবে। আসলে জিনিসটা কেমন দেখা দরকার। কিন্তু তার আশে-পাশে যে সকল জীবজন্তু বাস করতো তারা বললো, দেখ ভাই! বড়দের উপদেশ মানতে হয়। বাপ বলেছে–মানুষের কাছে যেও না, এটা বড় জালিম। সুতরাং তুমি মানুষ দেখার ইচ্ছা করো না। কেননা কোনো বিপদে পড়ে যেতে পারো। সে বললো, তা হবে কেন ভাই, কমপক্ষে একবার দেখে নেওয়া দরকার–এই জাতটা কেমন?

বাপের উপদেশ সে মানলো না। মানুষ দেখতে সে বের হয়ে পড়লো। প্রথমেই একটি ঘোড়া দেখতে পেল। ঘোড়াটি লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল। বাঘের বাচ্চা ভাবলো–মনে হয় এটা মানুষ। কেননা আমার বাপ ছিল দেড় গজ লম্বা আর এটা তার চেয়ে অনেক লম্বা আর অনেক উঁচু। দুই-তিন গুণ বড় বলেই আমার বাপ এটাকে ভয় পেতো। ভয় পাওয়ার কথাই তো বটে! সে ভয়ে ভয়ে ঘোড়ার কাছে গিয়ে বললো, আপনার নাম কি মানুষ?

ঘোড়া বললো, 'এই কোন জালিম বস্তুর নাম নিয়েছো? আমার সামনে আর কখনো মানুষ নাম নিও না। মানুষ যাকে বলা হয়, সে অত্যাচারী জীব। আমি অনেক মোটা তাজা ও শক্তিশালী। কিন্তু তবু মানুষ আমার পিঠে গদি কষে দেয়। আবার তার উপর উঠে বসে। ওরা আমাকে চাবুক মারতেই থাকে। তাই সব জিনিসের নাম নিও, কিন্তু এই জালিম মানুষের নাম নিও না। এটা একটা মহা মুসীবত।'

বাঘের বাচ্চা ভাবলো–মানুষ তাহলে কত বড় হবে? এই লম্বা চওড়া জন্তুটিও মানুষকে ভয় পায়। আর আমার বাপতো ভয় পেতে পেতে মারাই গেলেন। আরো এগিয়ে গেল সে। হঠাৎ একটি উট চোখে পড়লো। সে ভাবলো–এটাই হবে মানুষ। একটি অঙ্গও সোজা নয়। ঘাড় একদিকে, কোমর অন্যদিকে, পা আরেক দিকে। এটা ঘোড়ার চেয়েও চার হাত উঁচু। সে কাছে গিয়ে উটকে বললো, মানুষ কি আপনারই নাম?

উট বললো, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা! এই রকম জালিম চীজের নাম নিয়েছো তুমি? এর মতো জালিম আর হয়? আমি শুধু একা নই, আমার শত শত ভাই আজ এর হাতে বন্দী। আমার নাকের ডগার ছিদ্রের মধ্যে তারা দড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সেই দড়ি আমার সামনের ভাইয়ের পেছনে বেঁধে দিয়ে শত শত উটকে সারি বেঁধে মানুষের একটি মাত্র ছোট বাচ্চা টেনে নিয়ে যায়। আমরা কত কাঁদি, কত বিলাপ করি, কত চিৎকার দিই, কিন্তু মানুষের ছোট একটি বাচ্চা আমাদের টানতে থাকে। মানুষের কথার উপরে শত শত উটের একটি কথাও চলে না। এটা বড় জালিম চীজ। এ নাম আমার সামনে আর নিয়ো না।'

বাঘের বাচ্চা ভাবলো–হায় আল্লাহ! মানুষ কত বিরাট হতে পারে! এত বড় এই জন্তুটি, সেও মানুষকে ভয় পায়। ঘোড়া তো শুধু নিজের মুসীবতের কথা বলেছে। আর এটা দেখি তার সকল ভ্রাতৃসমাজের মুসীবতের কথা বয়ান করলো। একশ' উট এক সঙ্গে মানুষের একটি মাত্র বাচ্চার কারণে কাবু হয়ে যায়!

বাঘের বাচ্চা ভয়ে ভয়ে সামনে অগ্রসর হলো। হঠাৎ একটি হাতি দেখতে পেলো। সে ভাবলো–এটাই হয়তো মানুষ। কারণ চারটা মোটা খাম্বার উপর একটা বিল্ডিং এর মত দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের উপরে যেন একটি পানির ট্যাঙ্কি রেখে দিয়েছে। সুতরাং মানুষ এটাই। ভয়ে ভয়ে সে হাতির কাছে গিয়ে বললো, জনাব! আপনার নামই কি মানুষ? হাতি বললো, 'তৌবা আস্তাগফিরুল্লাহ! এই কোন্ মুসীবতের নাম নিয়েছো–আমার সামনে এই নাম উচ্চারণ করো না। এই জিনিসটা বড় জালিম। আমার দেহ বিরাট হতে পারে, তা সত্ত্বেও একটি মাত্র বাচ্চা মানুষ আমার পিঠে চড়ে বসে। তারপর তার হাতে লোহার ডাণ্ডা থাকে। একটু যদি এদিক-ওদিক করি, সেই লোহার ডাণ্ডা আমার মাথায় মেরে দেয়। আমি শুধু কাঁদতে পারি, বিলাপ করতে পারি, আর কিছু করতে পারি না। ঘোড়ার মুখে তো লাগাম লাগিয়ে সাওয়ার হয় আর আমাকে বিনা লাগামে কাবু করে ফেলে। লাগামও

নেই, আবার নাকের দড়িও নেই, তবু আমি মানুষের কাছে বাধ্য হয়ে পড়ি। এই মানুষ একটা আজীব চীজ।

ভাবলো–হায় রে! মানুষ তাহলে কেমন জিনিস? যাকেই দেখি, সে মানুষকে ভয় পায়। মানুষের নাম শুনলে কেঁপে উঠে। আর বলে–মানুষ জালিম চীজ। এই বলে সে আরও অগ্রসর হলো।

দশ বারো বছর বয়সের এক মিস্ত্রির ছেলে একটা মোটা কাঠ চিরার কাজে ব্যস্ত ছিল। কাঠের খণ্ডটি উঁচুতে একটি মাচায় রাখা ছিল। করাত চালাতে যেন সুবিধা হয়, যেন ফাঁক দু'দিক থাকে, সেজন্য আধা চিরা কাঠের মাঝখানে একটা কাঠি দিয়ে গোঁজা দিয়ে রেখেছিল। বাঘের বাচ্চা ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তার সামনে কাঠের খণ্ডের উপর বসল। সে কল্পনাও করতে পারেনি যে, এ ছেলেটি মানুষ। কারণ সে ঘোড়া দেখেছে, উট দেখেছে এবং হাতি দেখেছে। সবাই মানুষকে ভয় পায়। এত বড় বড় জন্তু এই ছোট ছেলেটিকে দেখে ভয় পাওয়ার কথা নয়। সুতরাং এটা মানুষ বলে কল্পনাও হল না তার। শুধু অনুসন্ধানের জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করলো, ভাই! কোথায় মানুষ পাওয়া যায়?

মিস্ত্রির ছেলে বললো–আমাকেই মানুষ বলা হয়। বাঘের বাচ্চা বললো, 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা! গজ খানিক লম্বা একটা ছেলে বলছে–আমি মানুষ! আমার বাপ কি তবে বোকা ছিল যে, তোকে ভয় পাবে? আমার সঙ্গে ইয়ার্কি? এক থাপ্পড় মেরে কাম সারা করে দেব।' তখনই ছেলেটি ভাবলো–হাজার হলেও এটা বাঘ। এর সঙ্গে শক্তিতে পারা যাবে না। সে দেখলো, কাঠের খণ্ডটি সে চিরার সময় যে একটা গোঁজা ঠুঁকে দিয়েছিল, বাঘের লেজটি তার ফাঁকে ঢুকে গিয়ে নিচের দিকে ঝুলে আছে। সে বললো–বাঘ মশাই! আপনি সবকিছুই করতে পারেন। আপনি জঙ্গলের রাজা। আপনার শক্তি আছে, আমার শক্তি নেই। তাই এই গোঁজাটি আমি খুলতে পারছি না। যদি আপনার শক্তি দিয়ে এই গোঁজাটি খুলে দেন, তবে আমার বড় উপকার হয়। বাঘ বললো, এটা একটা কাজ হলো নাকি? এই

বলে সে এক থাবা মেরে সেই গোঁজাটি খুলে ফেললো। আর অমনি দুই দিকের চিরা কাঠ চেপে এসে বাঘের লেজ আটকে ফেললো। বাঘের বাচ্চা কাঁন্নাকাটি করতে লাগলো, লেজ আর ছাড়াতে পারলো না।

এদিকে ছেলেটি শুরু করে দিল চিৎকার। 'বাঘ ধরেছি, বাঘ ধরেছি' বলে গাঁয়ের লোক ডাকতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে সারা গায়ের লোক জমা হয়ে বাঘের বাচ্চাকে বন্দী করলো লোহার খাঁচায়। মানুষ চেনার আগেই সে মানুষের একটি বাচ্চার হাতে এখন বন্দী।

সে এখন মানুষ চিনেছে। কিন্তু এখন আর চিনে কী লাভ? আজ তার রক্ষা নেই। কেউ বল্লম আনলো, কেউ বন্দুক, কেউ দা-বটি। মোটকথা, যার কাছে যা ছিল, তা-ই নিয়ে এসে বাঘের খাঁচা ঘেরাও করলো। আজ সবাই মিলে তাকে হত্যা করবে।

শিক্ষা : *মুরব্বীদের কথা না মানলে এভাবেই বিপদে পড়তে হয়।*

অন্যায়পুরের অন্যায় কাজ

এক গুরু তার এক শিষ্যকে নিয়ে অন্যায়পুর শহরে গেল। ওখানে গিয়ে দেখল, সবকিছু ষোল টাকা সের বিক্রি হয়। চাল, ডাল, আটা, তৈল, ঘি সবকিছু একই দাম–ষোল টাকা সের। গুরুজী শিষ্যকে বলল, চল এখান থেকে। এদেশ আমাদের বসবাসযোগ্য নয়। কেননা এখানে ভাল-মন্দ সবকিছু একই দামে বিক্রি হয়। তাতে বোঝা যাচ্ছে–এখানে কোনো ইনসাফ নেই। শিষ্য বলল, আমি এখানে থেকে যাব। বেশি করে ঘি খাব। স্বাস্থ্য ভাল হবে। গুরুজী যত রকমেই বুঝালেন, সে কিছুতেই এ শহর ছেড়ে যেতে রাজি হলো না। দীর্ঘদিন এ শহরে থেকে শিষ্য ভাল ভাল জিনিস খেয়ে খুব মোটা তাজা হয়ে গেল। ঘটনাক্রমে গুরু অন্য দেশ ঘুরে এসে শিষ্যের খোঁজ নিতে অন্যায়পুরে এলো।

একদিন গুরু ও শিষ্য উভয়ে শাহী দরবারে উপস্থিত হলো। দরবারে এক মোকাদ্দমা চলছিল। দুই চোর এক বাড়িতে চুরি করার জন্য সিঁদ কেটে একজন ঘরে ঢুকেছিল, আর অন্যজন পাহারায় দাঁড়িয়েছিল। তখন দেয়াল ভেঙে চাপা পড়ে একজন চোর মারা গেল। অপরজন আদালতে এই মর্মে বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা দায়ের করেছিল যে, সে এত দুর্বল দেয়াল বানিয়েছে যে, সাধারণ সিঁদ ভেঙে গিয়ে আমার সাথী মারা গেছে।

হাকিম সাহেব বাড়িওয়ালাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, হুজুর! এতে আমার কী দোষ? রাজমিস্ত্রী দেয়াল বানিয়েছে, দোষ হলে তার হবে। রাজমিস্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলে রাজমিস্ত্রী বলল, আমার দোষ হবে কেন? লেবার ভুল করে কম সিমেন্ট দিয়ে মসলা বানিয়েছে। দোষ হলে তার হবে। লেবারকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, হুজুর! পানি ঢালার যে লেবার ছিল সে পানি বেশি ঢেলে দিয়েছে, তাই মসলা খারাপ হয়েছে, দোষ হলে তার হবে। পানিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করা হলে পানিওয়ালা বলল, এতে আমার কোনো দোষ নেই, রাজার বাড়ির হাতিটা ছুটে পালাতে গিয়ে হাত থেকে পানির বালতি মসলার উপর পড়ে যায়, তাই মসলা পাতলা হয়েছে। মাহুতকে জিজ্ঞাসা করা হলো–হাতি কেন ছুটে আসল? সে বলল, ঝুমুর পরে এক মহিলা যাচ্ছিল। তার ঝুমুরের আওয়াজে হাতি এতটা পাগলা হয়ে ছুটেছিল। মহিলাকে উপস্থিত করা হলে সে বলল, আমার কী দোষ স্বর্ণকারই তো বাজনা দিয়ে ঝুমুর বানিয়েছে। স্বর্ণকারকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে কোনো উত্তর দিতে পারল না। অবশেষে এই মামলায় স্বর্ণকারের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

তাকে ফাঁসির কাষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু সে অত্যন্ত দুর্বল ও হালকা গড়নের হওয়ায় ফাঁসির কড়া তার গলায় বাঁধল না। জল্লাদ খবর দিল–এই ফাঁসি কড়ায় এমন তাল পাতার লোককে ফাঁসি দেওয়া যাবে না। এর জন্য আরও মোটা তাজা লোক চাই! তখন রাজার হুকুম হয়ে গেল–যাকে মোটা পাওয়া যায়, তাকেই ফাঁসি দিতে হবে। কেননা হাকিম নড়লেও তার হুকুম নড়বে না।

তালাশ করে গুরুজীর শিষ্যের মতো মোটা আর কাউকে পাওয়া গেল

না। ধরে নিয়ে আসা হলো তাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য। তখন সে গুরুজীর কাছে বলল, হুজুর! এখন কী করব? গুরুজী বললেন, আগেই তো বলেছিলাম, যে দেশে তেল আর ঘি এক দাম–এমন দেশে থেকো না। তুমি মানলে না। এখন ফল ভোগ কর। সে বলল, হুজুর! কোনো রকম প্রাণে বাঁচান। আমি তো আপনারই সন্তান!

গুরু ভেবেচিন্তে শিষ্যকে বাঁচানোর উপায় খুঁজে বের করল। তারা দু'জন পরস্পর সলাপরামর্শ ক্রমে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল। গুরু বলে–আমি ফাঁসিতে ঝুলব, শিষ্য বলে–অসম্ভব কথা! এ সুযোগ আমি কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেব না। জল্লাদ! তাড়াতাড়ি আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাও। তাদের দু'জনের ঝগড়া এতই চরমে উঠল যে, রাজার কাছে খবর পৌঁছে গেল। রাজা গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? তোমরা ফাঁসি নেওয়ার জন্য ঝগড়া করছ কেন? এমন আশ্চর্য কাণ্ড তো আর দেখিনি। গুরু বলল, হুজুর! এটা এমন এক মুহূর্ত–যে কেউ এ সময় ফাঁসি নেবে সে ব্যক্তি সোজা বেহেশতে চলে যাবে। এমন সুযোগ আর ফিরে আসবে না। রাজা বলল, তাহলে তো এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। জীবনে কত গুনাহ করেছি। আমার বেহেশতের দরকার। খুব তাড়াতাড়ি আমাকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুঝাও। শেষ পর্যন্ত ঐ রাজাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হলো।

শিক্ষা : *দেশে ন্যায়বিচার না থাকলে নিরপরাধ লোকেরও সাজা ভোগ করতে হয়।*

শেষ



নাদিয়াতুল কুরআন কুতুবখানা

ইসলামী টাওয়ার ১১ বাংলাবাজার ঢাকা

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়

মুনীরুল ইসলাম

প্রচ্ছদ : আশরাফুল ইসলাম

মূল্য : সত্তর টাকা মাত্র